

LAXMI BOOK BINDING &  
DYE PRINTING WORKS.  
5, Kumbhghata Lane,  
CALCUTTA-1.

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ
২৫০ ৭৩১	২৫/৫/৭৫ ১৫/১২				

**LAXMI BOOK BINDING &**

**DYE PRINTING WORKS.**

8, Karmavirchow Lane.

CALCUTTA-B.

[illegible]









সাহিত্য-গগনের কোন্ কোন্ উজ্জল নক্ষত্র, কমলিনী-সাহিত্য-  
যন্দিরের কৌণ্ডিন্যজা আলোকিত করিতেছেন—তাহাই দেখুন।

শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমারী দেবী।

শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবী।

শ্রীযুক্ত নিরুপমা দেবী।

শ্রীযুক্ত ইন্দিরা দেবী।

শ্রীযুক্ত শৈলবালা ঘোষজায়া।

শ্রীযুক্ত সরসীবালা বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

„ দুর্গাদাস লাহিড়ী।

„ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞানভূষণ।

„ হরিশাধন মুখোপাধ্যায়।

„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।

„ দীনেন্দ্রকুমার রায়।

„ কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম-এ।

„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি এল।

„ নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।

„ হেমেন্দ্রকুমার রায়।

„ বিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল।

„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

„ ব্রজমোহন দাস।

„ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

„ শরৎচন্দ্র পাল, পরিচালক।

প্রতিমাসেই সাহিত্য-জগৎঘরেরনা উল্লিখিত স্থলেখক লেখিকা-  
বৃন্দের একখানি করিয়া মনোমদ উপন্যাস—পূর্বের মতই আপনা-  
দের হাতে দিতে পারিব।

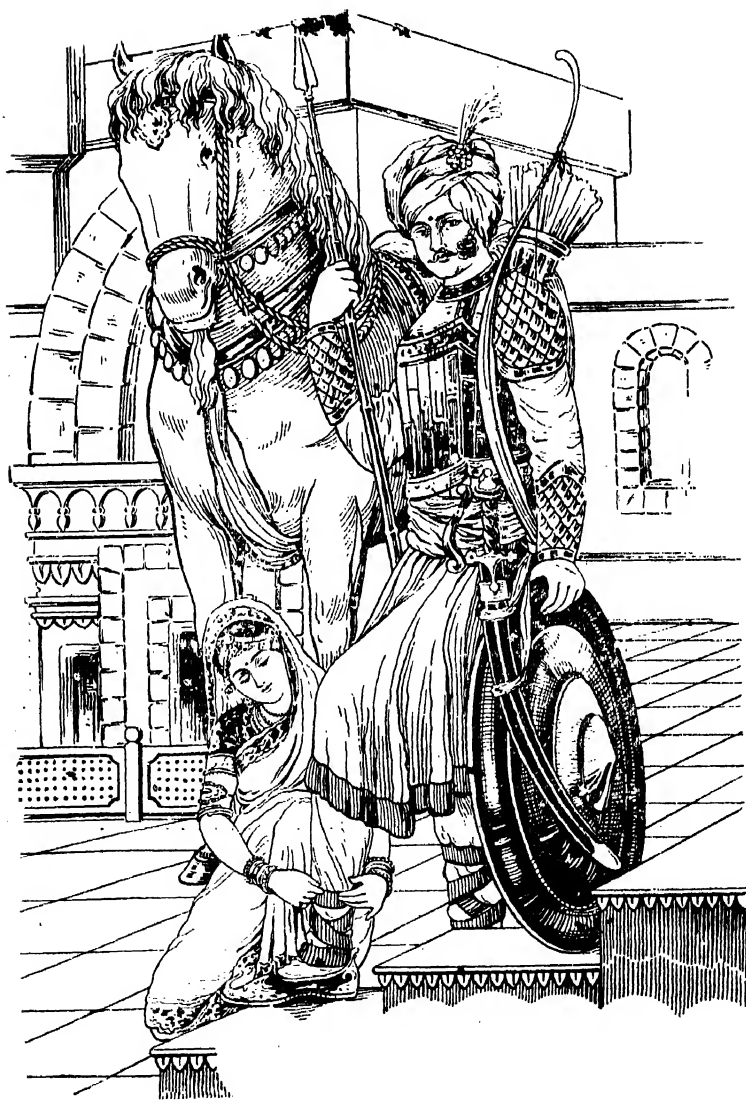
শ্রীগোষ্ঠসিহারী দত্ত

স্বর্ণকুমারী—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

কমলিনী-সাহিত্য-যন্দির

মিবার-গোরব বিজয়বীর  
রাঠোর-শিবাজী



“দিন্কা বাঘিনী, রাতকা ডাকিনী পলক-পলক লৌ শোমে !”

‘দীপালি’ প্রণেতার রক্তদ্বাস-উপহাস,

ভয়াবহ ঘটনা-সঙ্কল ডিটেক্টিভ রোমান্স

## মোটর ডাকাতি

মুদ্রাযন্ত্রের যত্নগা হইতে ১৫ দিনের মধ্যে মুক্তি লাভ করিবে।

সুন্দরী, তুমি কে ? সশস্ত্র পুলিশ তোমাকে দেখিলে পিচাট্টিয়া যায়, গোয়েন্দা তোমার বহুদ্রুপ-বহ্নিতে ইচ্ছা করিয়া পুড়িয়া মরে, তুমি কখন পুরুষ কখন নারী—

কখন রাজরাণী, কখন গ্রহরী, তুমি কেমন নারী !—বলিহারী তোমার চাতুরী।

সুন্দরীর তস্করলীলা—ছিঃ সুন্দরী—ছিঃ তোমায় শতেক ছিঃ !

রঙিন ছবি ঘেরা, বেশমণী বাধাই এটিকে ছাপা ১২ ডাকে ১৬০

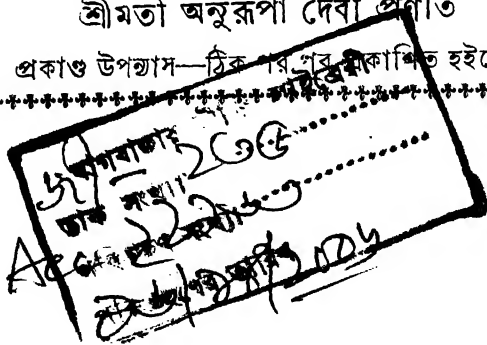
তারপর

প্রাচ্য-বঙ্গের জ্যোতির্ময়ী সাহিত্য-ত্রী—প্রাচ্যে প্রতীচ্যের ‘সিষ্টার নিবেদিতা’

মুর্তিমতী বাণী—উপহাস-মহারাজী ••

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

প্রকাশ উপহাস—দিক পূর্ব পূর্ব প্রকাশিত হইবে।



## উৎসর্গ।

সুপ্রসিক্ত ঔপন্যাসিক ও প্রথিতযশা পণ্ডিত স্বর্গীয় মাতামহ  
দামোদর মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানন্দ, বিদ্যাবিনোদ, এম, আর, এ, এস,  
মহোদয় পদাঙ্কজ্যেষ্ঠ,

দাদাবাবু—

শুন্তে পাই, স্বর্গ ও নরক এই বায়ুমণ্ডলেই। আকাঙ্ক্ষার  
নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী আত্মা উর্দ্ধে ওঠে—নামে। আপনার  
সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে। প্রাথতি যশ, দূর্জিত-কীর্তি, সাধনার  
প্রতিভা, অতুল্য প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, সংসারে যা কিছু  
প্রার্থনার;—সবটাই আপনি পেয়েছিলেন। তাই আমার  
বিশ্বাস, আপনার মুক্ত আত্মা আজও ঐ শূন্য থেকে আমাদের  
প্রতি আশীষ দ্বারা বর্ষন করছে। তারই নিদর্শন বৃষ্টি বা এই।

বিভূদাদা, আনন্দদাদা, ভুলো, খেঁদা ও আমি, আমরা এই  
কয়টি ভাই মিলে আপনার উপর অত্যাচার আক্রমণ করেছি  
অনেক। আপনি চলে গেলেন, একলা থাকতে বৃষ্টি বড় কষ্ট হল,  
তাই আমার মাকে, আমার মেজমাসীমাকে, আমার ভাইগুলিকেও  
সঙ্গে নিয়ে গেলেন; রেখে গেলেন, আমাকে আর আনন্দদাদাকে—  
মাতৃহীন দুইটি ভাইকে। কি উদ্দেশ্যে যে রেখে গেলেন তা  
জানি না;—না জানলেও আজ আমরা উভয়ে সংমিলিত করে, যে  
মালটি আপনার পবিত্র-আত্মার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে সম্ভুক্তিতে  
গেঁথেছি, সেটি অযোগ্য হ'লেও স্নেহে তা গ্রহণ করে আশীর্বাদ  
করুন, যেন আমাদের যোগ্যতা আসে, যেন আমরা আপনার  
পূণ্য নাম—আপনার চিরউজ্জল কীর্তি অক্ষত রাখতে সক্ষম হই;  
যেন আমরা দু'টি ভাই, দু'টি মহোদয়ের-ই মত চিব অবিচ্ছিন্ন  
থেকে আপনার পদাঙ্ক অনুসরণে আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত  
হতে পারি। ইতি—

আশীর্বাদপ্রার্থী স্নেহের সেবক—

১৩২৮ সাল।

প্রঅথ।

রাসপুণিমা,  
শ্রীমদ্ভগবৎ।

## কৈফিয়ত।

সাহিত্য-সুধারস এবং সাহিত্যোৎসাহীগণের সম্মুখে আজ আবার আমি শঙ্কাউদ্বেলিত অথচ আশা উৎফুল্লিত চিত্তে 'রাঠোর-শিবাজী'কে লইয়া সমুপস্থিত হইলাম। শঙ্কার কারণ, আমি অক্ষম অযোগ্য সাহিত্য-সেবক, তবে আশা, আপনারা যখন এ সেবকের 'রাজপুত্রের মেয়ে' দোকানদার, মাতাল প্রভৃতি উপগ্রাসগুলি আদরে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এখানির ভাগ্যও অপ্রসন্ন হবে না। তাই আমার এই হৃঃসাহস। আর এই হৃঃসাহসের জন্ত একা আমি অপরাধী নই।

আমার পিতৃতুল্য মহৎগুণরাশি সম্পন্ন, মহানচরিত্র পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও টালানিবাসী বিখ্যাত ধনকুবের স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্র-বংশধর, সদানন্দময়, সদাহাস্তময়, পরোপকার ব্রতধারী, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের উপদেশ ও কনিষ্ঠ সহোদরসম দীপ্ত প্রতিভাশালী নবীন সাহিত্যিক শ্রীমান সুবোধ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্য, এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ শালিখারাবের সুবিদ্বান আদর্শ চরিত্র আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সভ্যগণের জলন্ত উদ্বীপনাঃ-আমায় এই হৃঃসাহসিকের কার্যে ব্রতী করেছে। ইহা ছাড়া যখনই আমি অবসাদে অধৈর্য বা পরিশ্রান্ত হয়ে লেখনী ত্যাগ করেছি, তখনই আমার মাতৃস্বপ্নপুত্র অশেষ গুণগরিমামণ্ডিত, সর্ববিদ্যায় বিভূষিত পূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দ প্রকাশ ঠাকুর (বন্দোপাধ্যায়) আমার অবসাদগ্রস্তপ্রাণে নব উদ্ভাদনা এনে দিয়েছেন, আমার নিরুদ্ধ লেখনীর গতি সঞ্চালিত করে দিয়েছেন, ভাবে ভাষায় কল্লনায় আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে গুরুর মত, জনকের মত আমায় সাহায্য করেছেন, দোষ গুণ দেখিয়ে দিয়েছেন। এমন কি আমার লেখার সঙ্গে তাঁরও লেখা অনেক স্থলে মিশে গিয়েছে। তাই বলি, এ অপরাধে আনন্দ দাদাও একজন প্রধান অপরাধী।

পুস্তকখানির প্রথম তিন ফর্মার মধ্যে 'মহীপতি' নামের স্থানে অনেক স্থলে 'গোপীসিংহ' এবং 'ঈশ্বরীসিংহের' স্থানে হৃঃ এক জায়গায় 'ঈশ্বর-সিংহ' হয়েছে। এ অমার্জ্জনীয় অপরাধ চিবস্তন প্রথাত্মবাধী আমার স্বাস্থ্যের উপর চাপাচ্ছিনা, এ অপরাধ সম্পূর্ণ আমার। সেইজন্য যুক্তকর।

বিনীত গ্রন্থকার।

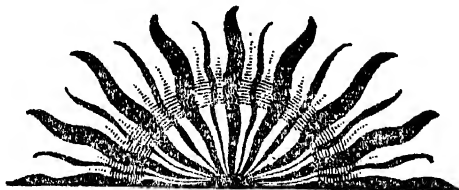


স্বাধীনতা





নিশিভোরে সে যে এসেছিল গো, মুখেতে ছিলনা রা-টি,  
পরশে জাগায়ে চলে গেছে শুধু—কিসের পরশ সেটি ?



মিষ্টি-উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা সৌরীনবাবুর “সোনার-কাঠি”

সাহিত্য-মহামাণ্ডী বাংলার মোগাসা—ভারতী-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত সৌরীনন্দমোহন ঘুখোপাধ্যায়

বি-এল, মহাশয়ের বাত্মন্ত্রে গড়া—পাকা-সোনার

## সোনার-কাঠি

আমাদের অগ্রহায়ণের সপ্তবিংশ সম্পূর্ণ উপন্যাস ।

ভরিকরা একরতিও পানমরা নাই, একেবারে নিখাদ—

পাকা সোনার বাট !

উপক্রমণিকায় সোনা—উপহারে সোনা—উপসংহারে সোনা—যেন স্বপ্নরাজ্যে  
সোনার ইন্দ্রপুরী ! জ্বালাময় সংসারটা এই ‘সোনার-কাঠি’র স্পর্শেই সোনায়-  
সোনায় স্বর্ণময় হইয়া উঠিবে । স্পর্শমাত্রেই—তর-সোনা সোনা হইতেছে—মাটি,  
তামা, সোনা হইতেছে—দেখিতে দেখিতে সারা দুনিয়াঃ সোনা হইয়া গেল !

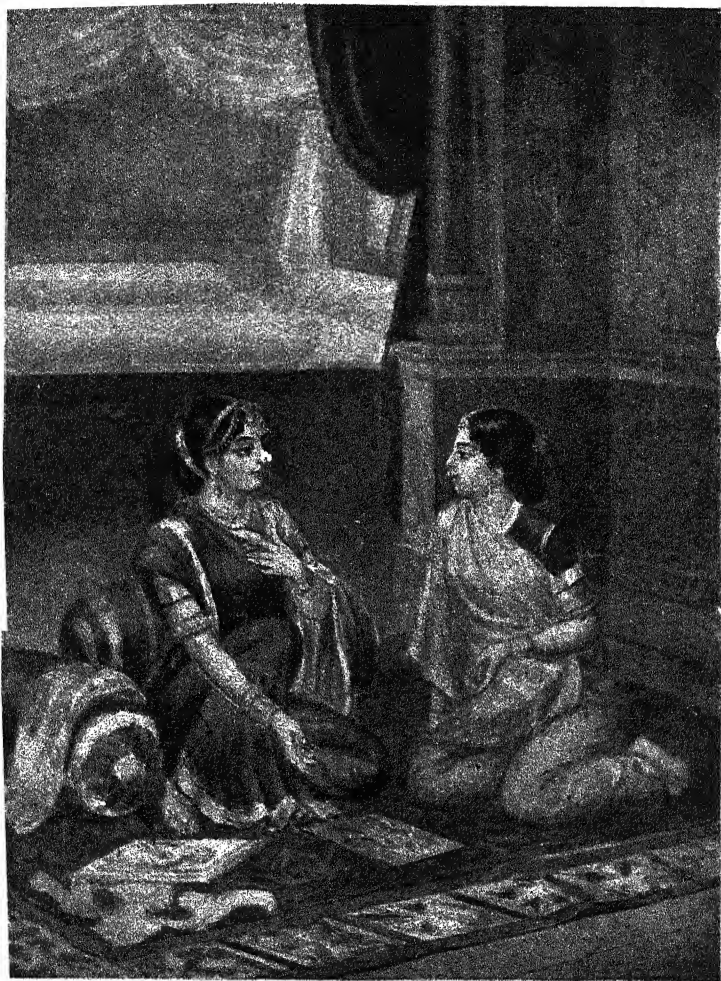
Golden tuch ! উপন্যাস-সাহিত্য সাম্রাজ্যে

সৌরীনবাবুর Golden tuch !

নগদ মূল্য ১/- এক টাকা । ডাকে ১৮/- এক টাকা দুই আনা ।



## ৰাঠোৰ-শিৰাজী



“তুমি না বল্লেও আমি বুঝেছি, ওছবি ৰাঠোৰ শিৰাজীৰ।” (১০৯ পৃষ্ঠা)

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিৰ।



# রাঠোর-শিবাজী ।

১৯০২২

‘নাট্যোপন্যাস’

১৯০২২

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“কোথায় ?”

“ঐ দূরে ।”

“কৈ, দেখি ।”

প্রাঙ্গণকারী যুবক, দর্শনরত ব্যক্তির হস্ত হইতে দূরবীক্ষণ গ্রহণ পূর্বক কি দেখিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে সাস্চর্য্যে যুবক বলিয়া উঠিলেন, “এ কি ?”

“কি দেখ্‌ছো ?”

“এ যে বিকানীরের রাজা !”

“সে কি ! বিকানীরের রাজা ? অসম্ভব ।”

“আমার চক্ষুকে তো অবিশ্বাস করিতে পারি না, দাদা !”

“কেমন ক’রে জান্‌লে যে, ঐ বিকানীরের রাজা ।”

“ও দেবমূর্তি পূর্বে দেখেছি ।”

“তারপর, আরও কিছু নূতন দেখ্‌ছো ?”

“হাঁ।—পর্বতের পার্শ্বদেশ থেকে বহু অশ্বারোহী সৈন্য নির্গত হ’য়ে, রাজাকে ঘিরে ফেলেছে। পরিধানে তাদের রক্তবস্ত্র,—ললাটে রক্তটীকা—গলে রুদ্রাক্ষের মালা—আর হস্তে তাদের স্তদীর্ঘ কুপাণ।”—

“কি অল্পমান হয়!”

“অল্পমান—এরা দম্ভ্য-সৈন্য। দাদা—গেল! গেল!”

“কি?”

“দম্ভ্যসৈন্য রাজাকে ভীষণ বেগে আক্রমণ করেছে। সংখ্যায় তারা রাজ্যসৈন্য অপেক্ষা দ্বিগুণ। দাদা, রাজপুত্রের গরিমার গান, সজীবতার প্রাণ, উৎসাহের তান—বুঝি নীরব নিম্পন্দ হয়ে যায়,—বিকানীর-আকাশের দীপ্ত উজ্জল সূর্য্য বুঝি বা অন্ধকার সাগরগর্ভে ডুবে যায়।”

“তাইতো—বড় চিন্তার কথা।” জ্র-কুঞ্জন করিয়া যুবক বলিলেন, “চিন্তা! কিসের চিন্তা, দাদা?—রাজপুত্রের অভিধানে চিন্তা বা শঙ্কার স্থান নাই। সম্মুখে কর্তব্যের আহ্বান—ছুটে চল দাদা, আলোকিময় জীবন-প্রভাতের পথে অগ্রসর হও দাদা, মস্তকে যশের কনক-কিরীট শোভিত হোক,—কেটে যাক, কেটে যাক, এ ঘন-ঘোর কৃষ্ণ মেঘ, ফুটে উঠুক বিশ্ব-আলোকে গৌরব-গরিমা, নেচে উঠুক হরষে পিতামহের আত্মা! পিতামহ জয়চাঁদের কলঙ্ক-মসী শোণিত-তরঙ্গে ধৌত ক’রে—সোজা হ’য়ে, মাছুষ হয়ে পাড়াব বিশ্বাকাশতলে। আর না হয়—লুপ্ত হোক আমাদের নাম—আমাদের স্মৃতি, ধরণী হ’তে।”

পর্বত-শৃঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্বক স্বর্গগত জয়টাদের কনিষ্ঠ পৌত্র, রাজ্যাহারা—সর্বস্ব হারা শিবাজী ডাকিলেন, “সৈন্তগণ ?”

তাঁহার দুই শত মাত্র সৈন্ত একটা বৃক্ষাদিপরিপূর্ণ প্রস্তর স্তূপের তলে শায়িত ছিল—প্রভুর আদেশে তাহারা উঠিল। দীপ্ত দৃঢ় সতেজ কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “সৈন্তগণ ! আজ তোমাদের উজ্জল জীবন, আজ তোমাদের উচ্চ মরণ। কলঙ্কের তাড়নায় তঙ্করের ন্যায় অরণ্যে আশ্রয়, নিশাচরের ন্যায় অন্ধকারে ভ্রমণ, সদা কলঙ্কের হিমালয় বহন—আজ তার অবসান। প্রস্তুত হও—মরণে জীবন বহন করতে প্রস্তুত হও সৈন্তগণ ! আজ বিকানীরের—শুধু বিকানীরের কেন—সমগ্র রাজ্যস্থানের একমাত্র গৌরব-প্রদীপ—দস্যুর ফুৎকারে নিক্ষিপিত-প্রায়। যদি সেই প্রদীপ, হৃদয়ের গাঢ় শোণিত ঢেলে প্রজ্জ্বলিত রাখতে পার,—তা হ’লে এই পর্বতশৃঙ্গ, তোমাদের বীরত্বে কেঁপে উঠবে—নত হয়ে তোমাদের অভিবাদন করবে। নিঃশব্দে হৃণদলোপরি ছুটাও অশ্ব। যদি জীবনে, মরণ না চাও, যদি মরণে জীবন লাভের ইচ্ছা থাকে,—তবে ছোটাও অশ্ব। এই প্রস্তরস্তূপের মত, দস্যুর শিরে পতিত হ’য়ে শত চূর্ণ ক’রে দাও—গুড়িয়ে দাও রাজশক্রের মস্তক !”

শিবাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বয়-পূর্ণ বদনে এবং প্রতিকূল কণ্ঠে বলিলেন, “সে কি ! তুই কি সত্যই দস্যু-সৈন্ত আক্রমণ করবি নাকি ?”

“নিশ্চয়ই। এ কল্লিয়ের কন্দ, রাজপুত্রের ধর্ম ; এতে

বিশ্বের কি আছে দাদা? কে, কোথায়, কবে, কোন্ সশস্ত্র রাজপুত্র, বিপদাপন্নের সাহায্যার্থ কোষোন্মুক্ত অসি হস্তে অগ্রসর না হ'য়ে, পুত্র ত্রায় লালুল সঙ্কোচনে, স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে বিবরে দেহ গোপন ক'রছে দাদা?"

“কিন্তু তোর সৈন্ত নেই—”

বাধাদানে শিবাজী বলিলেন, “না থাক, তবুও যাব,—একা যদি যেতে হয়, তবুও যাব। আজ রাজবারার মণিময় শৌর্য-সুস্তু রক্ষার্থ যদি মরি, তথাপিও আমাদের জীবন। জয়চাঁদের পৌত্রের নামোচ্চারণে তখন আর কেউ স্থগায় ক্রকুন্ডিত করবে না, বরং রাজস্থানের গর্বতশৃঙ্গে শৃঙ্গে আমাদের কীর্তি-গান সমুখিত হ'য়ে, আমাদের কলঙ্ক ও ঘৃণার দু'টা কুমেরু কুমেরু চৌচির ক'রে দেবে, আর যদি রক্ষা করতে পারি, রাজস্থান আদরে গৌরব-মালা কণ্ঠে পরিয়ে দেবে—আনন্দে সব ভুলে বাহ প্রসারণ ক'রে বক্ষে টেনে নেবে—উল্লাসে পুষ্প বরিষণ করবে। তাই বলি, সজীব দেহ মৃত্যুর তলে লুকিয়ে না রেখে, কর্মের চলন্ত স্রোতে—কীর্তির পথে ছুটিয়ে দাও। আর বিলম্বের অবসর নেই। সৈন্তগণ! ছোটাও—ছোটাও! বিজলী-গতিতে ছোটাও তোমাদের পঞ্চ-কল্যাণ অশ্ব।”

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

“সেতু নাই !”

“না সেনাপতি, সেতু নাই !”

বিশাল বাহিনী নির্বাক-বিস্ময়ে স্তম্ভিত হিমাচলের স্থায় দাঁড়াইল। নীরব-বিস্ময় সকলের নয়নে বদনে প্রকটিত হইল।

সেতু নাই—সেতু নাই ! মূহু কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ-জড়িত ধ্বনি, বাহিনীর শেষ প্রান্তে পৌছিল। একটা অতি মাত্র বিষাদভাব-স্রোত, বিরাট বাহিনীর বক্ষের উপর ছুটিয়া চলিয়া গেল।

“সেতু নাই, সেতু নাই ! একি বাধা—একি দুর্ভাগ্য বিষয় এনে দিলে দয়াময় ! কেমন ক’রে এমন ধারা হলো রণে ?”

বিকানীর রাজের প্রধান সেনাপতির উত্তরে, সহকারী সেনাপতি রণেন্দ্র বলিলেন, “বোধ হয়, প্রবাহিণী প্রবল তরঙ্গে কাষ্ঠসেতু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।”

“সম্ভব। নিয়ে গেছে, প্রবাহিণী নিয়ে গেছে ! কি নিয়ে গেছে জ্ঞান ? তুমি দেখছ সেতু, আমি দেখছি—প্রবাহিণী সেতু নিয়ে যায় নি, নিয়ে গেছে আমাদের রাজাকে—রাজস্থানের গৌরব-কনক-সুভক্তকে—আমাদের আশা ভরসা,—আমাদের সব, সব নিয়ে গেছে। আমাদের বাহুর শক্তি—বুকের শোণিতটুকুও নিয়ে গেছে।”

“সেতু নাই বলে এত ব্যাকুল কেন ? রাজা তো একক বা নিরস্ত্র নন, তবে এ ব্যাকুলতা কেন সেনাপতি ?”



“কেন? কেন এ ব্যাকুলতা? রণেন্দ্র—না, তুমি বুঝবে না। নব-নিযুক্ত তুমি,—রাজাকে এখনও চেন নি, এখনও সম্যক বোঝ নি।

যখন দুর্দ্বন্দ্ব দস্যুর আক্রমণে আমাদের সৈন্তেরা শ্রান্ত ক্লান্ত হ’য়ে পড়লো, যখন দস্যু-সর্দারের ভীম করবাল আঘাতে আমাদের সতেজ দেহের স্বদৃঢ় মুষ্টিও শিথিল হ’য়ে পড়লো, তখন বৃদ্ধ রাজা, তিন সহস্র মাত্র সৈন্ত সহায়ে শত্রুবক্ষে ক্ষিপ্ত একটা সাগর-তরঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমার তখন মনে হল, যেন প্রমত্ত প্রমথনাথ সংহারমূর্তিতে আবির্ভূত, যেন তারকারি দানবদলনে রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে উন্নত! দেখলুম, যেন—রাজার নয়নে প্রজ্বলিত লেলিহান পাবক-শিখার স্ফুলিঙ্গ—বদনে একটা অতুল উজ্জল গরিমালোক—দেহে এক অনাবিল, অভাবনীয় জ্যোতির ছটা—আর হস্তে যেন শত্রু-বিজলীর সমাবেশ।

সে অপূর্ব বিরাট বীরমূর্তি দর্শনে আমি স্তম্ভিত হলাম। রাজার সর্বাঙ্গ শোণিত-স্নাত, কিন্তু রাজার তা’তে ভ্রক্ষেপ নাই,—দৃকপাত নাই,—নয়নে বদনে কাতরতার লেশ মাত্র নাই! সে তেজোদীপ্ত বীরত্বব্যঞ্জক বপুর দর্শনে আমি বিস্মিত হলাম। উন্নত শত হস্তীর শক্তি ধারণ পূর্বক যুবকের উৎসাহে রাজা দস্যু-সৈন্য মথিত, দলিত, বিমর্দিত করিলেন, সে অলৌকিক জয়-বাহিত শৌর্য বীর্য দর্শনে লজ্জায় আমার মাথাটা নত হয়ে পড়লো, অস্ত্রশিক্ষায় দৃঢ়া হলো, নিজেকে শিশু জান করলুম।

রাজা যখন প্রাণরক্ষার্থ পলায়মান দস্যুসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন ক'রলেন, তখন আমি কি দেখলুম, জ্ঞান ?—

“না, কি দেখলেন ?”

“কিছু না,—শুধু দেখলুম, বায়ুতরঙ্গে একটা ধূলিপ্রবাহ ছুটে চ'লে গেল। যেন স্ত-উচ্চ শৈলশিখর হতে একটা প্রবল-ঝটিকা প্রবাহিত হ'য়ে গেল। যেন শত তীর প্রবল বেগে এককালীন বায়ুবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে চলে গেল। বৃদ্ধ রাজার যুবকের শক্তি, বিদ্যুতের গতি দর্শনে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত শুধু সেই দিকে চেয়ে রইলুম, আর শুধু ভাবলুম—রাজা দৈবানুগৃহীত দৈব-শক্তিসম্পন্ন। ভাবলুম—হাঁ, এ বীরত্ব শেখবার, পূজা করবার, চাইবার। তার পর প্রকৃতিস্থ হ'য়ে রাজার সাহায্যার্থে আমার সৈন্যদেরও আদেশ দিলুম। কিন্তু আমার অকর্মণ্য সৈন্যেরা পারলে না,—বৃদ্ধ রাজার পশ্চাদ্ধাবনেও তারা অক্ষম হ'ল, অপদার্থ, আবর্জনা সব।

রণেশ্বরনারায়ণ, ভেবেছ কি সেই রণদেবতা,—বীরত্বের জলন্ত মূর্তি দৃঢ়তেজা রাজা যখন দস্যু সর্দারের পশ্চাদ্ধাবনে অশ্ব ছুটিয়েছেন, তখন শত্রুকে দুর্গ পর্য্যন্ত বিতাড়িত না ক'রে, মধ্য পথে গতি রুদ্ধ ক'রে বিকানীরের প্রতি চাইবেন ?—না ! স্বপ্নেও তা ভেবোনা, অস্তুরেও তা কল্পনা করোনা !

আর যে দস্যু-সর্দার লক্ষ ফুলানের প্রতাপে, সমগ্র রাজ্যস্থান প্রকম্পিত—সম্রাট, যার নামোচ্চারণে আতঙ্কে সকলে নয়ন মুদ্রিত করে, শত বীরের বাহু যার শক্তিকে প্রতিহত ক'রতে সক্ষম হয়নি,

রাজ-রাজেশ্বরের ন্যায় যার স্বতিগান নাগরিকেরা পথে পথে  
গেয়ে বেড়ায়, যার বাহুর শক্তির নিকট আমাদের মুষ্টি শিথিল  
হ'য়ে প'ড়েছে, সে দস্য বড় সামান্য নয়। লাক্ষ্মীনাথ, দস্য  
হলেও বীর, যোদ্ধা, মহাপ্রতাপশালী সাহসী ও অস্ত্র-কুশল;  
সামান্য সৈন্য সহায়ে সে বিকানীতে আগুন জালিয়ে চলে গেল। সেই  
অপরাজেয় অসীমশক্তিশালী সর্দার রাজার নিকট এ পরাজয়ের  
অপমান কখনই সহ্য করবে না,—পৈশাচিক প্রতিশোধ নেবে।  
তুর্গে তার অসংখ্য সৈন্য আছে। সেই তুরারোহ তুর্জয় পর্বতোপরি  
অবস্থিত ফুলারা তুর্গ-সান্নিধ্যে একবার যদি রাজাকে সে পায়,—না,  
সে কথা ভাবতেও বক্ষ-শোণিত নিরুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে—ঐ প্রভাবিত  
সুখ্যলোকও ঘন ব'লে 'মনে হচ্ছে—আমার মহাপূজ্য আবাল্য-  
প্রতিপালক শিক্ষাগুরু—অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা—আমার দেব-  
তুল্য প্রভুর—পিতার মহামূল্য জীবন আজ শত্রু-কবলিত,—  
অথচ আমি জীবিত—সশস্ত্র। আজ রাজস্থানের চিরোজ্জল  
বীরত্ব-ভাস্কর নিভে যেতে বসেছে—একটা হিমালয়ের ন্যায়  
বিরাট বিশাল কীর্তিস্তম্ভ ভেঙে পড়ি,—সঙ্গে সঙ্গে বীরত্বমণ্ডিত  
—শত সহস্র বীরের শোণিতে সঞ্চিত বিকানীর সিংহাসনও ডুবে  
যায়, অথচ আমার বাহুতে শোণিত প্রবাহিত—নয়নে জ্যোতি  
পরিষ্কৃত! না, না, তা হবে না,—এমন ভাবে ডুবতে দেবনা!—  
এমন ভাবে রাজস্থানকে অন্ধকারের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিস্  
নি প্রবাহিনি!—শোণিতসম অস্ত্রে রাজবারার যুতিক সিন্ধু  
করাসনি উদ্ভাঙ্গিনি!—এমন ভাবে কীর্তির একটা স্বর্ণ-সোপান

চূর্ণ ক'রে ভেঙ্গে দিস্নে কলনাদিনি ! দে, দে, থাকিয়ে দে  
এ প্রবল নর্তন ! সন্মরণ কর প্রথরা—এ সপ্ত সমুদ্রের ভীম গর্জন ;  
রুদ্ধ কর রুদ্ধ কর ভীষণ প্রলয় প্রাবন,—শুধু কর ক্ষণিকের  
জন্ম,—শুধু কর জলময়ি তোর হৃদয় ! একবার—একবার—  
একটা বার—এক মুহূর্তের জন্য বিপুলাকায়া ক্ষুদ্র কর, নীর্ণ কর  
নৃত্যময়ি ! আমার রাজাকে ডুবাস নে পাগলিনি !

কি, কি ! শুনলিনি—শুনলিনি !—এত করে বল্লম তবু শুনলিনি  
বধিরা ! তবুও তোর তরল হৃদয়ে আঘাত লাগল না ! পিশাচিনী  
সংহারিণি ! তবে দেখ, তোর বক্ষ দীর্ণ বিদীর্ণ করে ছুটে চলে  
যাব । সাধ্য থাকে, দে, বাধা দে, দেখি তুই কত শক্তিময়ী—  
কত গভীরা ! সৈন্যগণ ! তোমাদের রাজা—তোমাদের  
গৌরব—তোমাদের প্রতিষ্ঠা এই সংহারিণী প্রবাহিণী ডুবিয়ে  
দিতে বসেছে ! দিও না, এমন ভাবে—এতদিনের প্রতিষ্ঠা  
অতল বারিগর্ভে ডুবিয়ে দিতে দিও না, তোল—তোল প্রাণ  
দিয়ে তোমাদের স্বর্ণ কীর্তি-কিরীট তুলে নাও—প্রাণ দাও,  
প্রাণ দিয়ে অমরত্ব গ্রহণ কর । তরঙ্গ-সঙ্কুল এই তটিনীর  
বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়, ঝাঁপিয়ে পড় সব,—বারি তরঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন  
ক'রে অগ্রসর হও—ঐ ভীষণা প্রবাহিণীর গর্ভ হ'তে  
তোমাদের কীর্তি-সিংহাসন তুলে নাও !”

কিন্তু সেই রণরঙ্গিণী ধ্বংসরূপিণী নদীবক্ষে কেহই বাস্প-  
প্রদানে সাহসী হইল না । জড়ের মত নীরবে—নিষ্কম্পদেহে  
সকলে দাঁড়াইয়া রহিল ।

তক্ষণে প্রদীপ্ত হতাশনসম ক্রোধে জলিয়া সেনাপতি বিক্রমসিংহ দস্তে দস্ত নিষ্পেষিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

“তবুও সব নীরব নিরুদ্বেগ দেহে নিজীব পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে রইলে,—ধমনীতে উষ্ণ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হ’ল না ! ক্রোধে অসি ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো না ! আশ্চর্য—আশ্চর্য তোমাদের প্রভুভক্তি !—আশ্চর্য তোমাদের জীবনে শৃগালের ন্যায় মমতা ! বোধ হয় তোমরা রাজপুত নয়,—রাজপুত-ললনার স্তনহৃদয়ে কখনই তোমাদের দেহ পুষ্ট হয় নাই !—বীরত্বগর্ভমণ্ডিত রাজপুতের ঔরসে তোমাদের উদ্ভব হয় নি । অথবা তোমরা বিধাতার একটা অভিশাপ—শুধু জাতির কলঙ্ক বর্দ্ধিত করতে আবর্জনার মত পৃথিবীতে এসেছ, তোমরা রাজপুত নয়, তোমরা মানুষও নয় ! কিন্তু আমি আমার রাজাকে রক্ষা করবো—রক্ষা করবো ! মরি যদি, ক্ষতি নাই—অমর হবো ! বাঁচি যদি দেবশীর্ষাদের অধিকারী হবো !

তোল তরঙ্গময়ি ! আকাশম্পর্শী তোমার তরঙ্গ তোল, তথাপি তোমার তরঙ্গ বিদীর্ণ করে, রাজার রক্ষায় অগ্রসর হবো । একলিঙ্গ দেব ! মা ঈশানি ! ক্ষণেকের তরে অটুট নির্ভর দে—অতুল শক্তিতে আমায় শক্তিমান কর সাগরগামিনী ! দেখ, কেমন ক’রে, তোর প্রবল শক্তিকে মথিত ক’রে অগ্রসর হই ।”

সতাই সেনাপতি বিক্রমসিংহ কল্লোলিনী-বক্ষে বস্প প্রদানে উদ্যত হইলেন, এমন সময়ে আবেগজড়িত কণ্ঠে রণেন্দ্র-নারায়ণ ডাকিলেন, “সেনাপতি !”

রুদ্ধগতিতে সেনাপতি পশ্চাতে ফিরিয়া, রণেশ্বরের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “আমার এই শুভ মুহূর্তে কেন বাধা দিলে রণেশ্বরনারায়ণ !”

“বাধা দিই নি সেনাপতি ! কে এমন অধম রাজপুত্র আছে যে, তোমার এ পবিত্র ব্রতে—এ পুণ্য জীবন-যজ্ঞে উৎসাহ না দিয়ে বাধা দেবে ? বাধা দিইনি সেনাপতি, তবে, একটা ভিক্ষা চাইছি।”

“ভিক্ষা ! এই মরণোন্মুখের নিকট তোমার কি ভিক্ষা রণেশ্বর !”

“ভিক্ষা—আমাকেও তোমার এই পবিত্র ব্রতের সঙ্গী কর। আমি যে তোমাব সহকারী। সহকারীর এ কাতর ভিক্ষা পূর্ণ কর সেনাপতি !”

বিস্ময়-চকিত-নয়নে সেনাপতি রণেশ্বরনারায়ণের বদন প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, তরুণ যুবকের মুখমণ্ডলে তরুণ তপনের জ্যোতিঃ—নয়নে বিদ্যুৎ-দ্যুতি।

আবেগ-সিক্তকণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন,—“তুমি যাবে ! জীবন-যজ্ঞে আমার সঙ্গী হ’বে ! তুমি রাজাকে এত ভালবাস রণেশ্বর ?”

“রাজাকে ভালবাসি না, তবে কীর্তিকে আমি বড় ভালবাসি। আমি চাই কীর্তির পূজা করতে,—কীর্তির সোপান নির্মাণ ক’রে স্বর্গে উঠে যেতে।” অধিকতর উজ্জল আভার রণেশ্বরের নয়ন, বদন উজ্জলিত হইয়া উঠিল।

তদর্শনে আনন্দেচ্ছাসিতকণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, “বা :

চমৎকার! তুমি আমার সাধনার সহকারী—আমার যোগ্য শিষ্য। তবে এস শিষ্য, এস আমার প্রিয়,—এস শিক্ষাগৌরব, এস সহোদর! ছ'জনে হাত ধরাধরি করে, চলে যাই ঐ অনন্ত কীর্তির রাজ্যে—ঐ আলোকময় আকাশে!”

উভয়ে কলনাদিনীর বক্ষে বাস্প প্রদানে সমুদ্যত হইলেন।

সহসা বজ্রধ্বনিবৎ দুরাগত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—“সেনাপতি, সর্বনাশ উপস্থিত! দস্যুর অহুচর বিকানীরে প্রচ্ছন্ন ছিল। হুর্গ শূন্য, রাজ্য অরক্ষিত দেখে, তারা একসঙ্গে রাজপ্রাসাদ ও হুর্গ আক্রমণ করেছে; মহারানী বিপন্ন, হুর্গ ভগ্নপ্রায়!”

প্রলয়কল্লোল-ধ্বনির মত সে ধ্বনি উভয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত দেহ প্রকম্পিত করিয়া দিল। চরণ আর উঠিল না, চক্ষের আলোক ডুবিয়া গেল। শত দাবাগ্নির অনল উভয়ের হৃদয়ে জলিয়া উঠিল।

উর্দ্ধে নিরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন,—  
“এ কি করলে জগদীশ্বর! সাধনার পথ কেন ভেঙ্গে দিলে দয়াময়! কি পাপ করেছে বিকানীর, যার জন্ত বজ্রপ্রহরণে তার সব আশা চূর্ণ করে দিলে? একদিকে রাজার জীবন, আমার প্রভুর প্রাণ, আমার মনুষ্যত্বের—বিবেকের আকর্ষণ; অন্যদিকে জন্মভূমি বিকানীর শত্রু-পদদলিতা—আমার কর্তব্যের আহ্বান! এ কি গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করলে বিধাতা! কি করি, আমায় বলে দাও দয়াময়!”

“ক্লান্ত কম্পিত জড়িত কণ্ঠে রণেন্দ্র বলিলেন,—



- 267

22263

4/28/2026

প্রথমখণ্ড চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত  
রাষ্ট্রোন্নয়ন-শিবাজী

স্বামীশক্তি! কর্তব্যই ধর্ম—দেবনির্দিষ্ট পথ। রাজা গেলে রাজা পাবে; কিন্তু রাজপুত্র-ললনার মর্যাদা গেলে কোটি বর্ষ ত্রিভুবনবিদারী উচ্চ আর্তনাদ করলেও আর তা ফিরে পাবে না—আর তা ফিরে আসবে না। বিকানীর-সিংহাসন গেলে—মানবের ঘৃণা ও জন্মভূমির অভিসম্পাতে আমাদের আত্মা শত জন্ম যাতনায় ছটফট করে কৈদে বেড়াবে।”

“তুমি ঠিক বলেছ, সহকারি! তবে তাই হোক, আমি কর্তব্য বেছে নিলুম। জননী জন্মভূমিকেই শীর্ষে তুলে নিলুম। ভগবন, যদি তুমি জড়পিণ্ড না হও, যদি তোমার অস্তিত্ব থাকে, তা হ’লে আমার রাজাকে রক্ষা কোরো—অটুট বিশ্বাসে আমার রাজার রক্ষার ভার তোমারই হস্তে দিয়ে গেলুম। যদি আমার এ অটুট বিশ্বাস ভঙ্গ হয়, তবে যেখানে তোমার যত মৃষ্টি আছে, সর্ব চূর্ণ করবো, তোমার জড় মূর্তির লোপ ক’রবো। সৈন্যগণ, বিকানীব পাশে দাঁড়াও—রাহিনী—চালাও অশ্ব, বিজলী গতিতে।”



### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

“ধন্য, ধন্য, শত ধন্য তুমি রাজা, শত ধন্য তোমার অস্ত্রশিক্ষা, সাবাস তোমার সাহস, চমৎকার তোমার বীরত্ব! তোমার অতুল শৌর্য বীর্যে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। এই বৃদ্ধ বয়সেও তোমার বাহতে এত শক্তি রাজা!”



ধর্মসিক্ত ললাটে বাম হস্ত অর্পণ পূর্বক বৃদ্ধ বিষ্ণু-প্রতি  
দহ্যসদৃশ লাক্ষ্মীলানের প্রতি প্রশান্ত, পবিত্র, বীরবাহি-  
প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক বলিলেন, “শক্তি! কোথায় শক্তি  
দহ্য? শক্তি নেই,—শক্তি হারিয়েছি। শক্তি থাকলে কি তোমার  
ত্রায় দহ্যর স্পর্ধা—রাজস্থানের আকাশ চৌচির করে দিতে  
পারতো? শক্তি থাকলে কি তোমার অহুচরদের অসি এখনও  
উর্দ্ধে উত্তোলিত থাকতো? শক্তি থাকলে কি তোমার  
ঐ সু-উচ্চ পর্বতোপরি স্থাপিত ফুলগড় দুর্গ এখনও সোজা ভাবে  
দাঁড়িয়ে থাকতো? না, শক্তি নেই। বড় বৃদ্ধ—বড় দুর্বল হয়ে  
পড়েছি, নতুবা তোমার স্পর্ধা—গর্ভ, ঋষিরস্ত্রোতে ভেসে যেতো,  
তোমার ঐ দুর্গ আমার পদতলে লুপ্তিত হতো। কিন্তু, যৌবনের  
সে তেজ—সে শক্তি আর নেই; সে সমুদ্রের প্রতাপ—বিদ্যুতের  
ক্ষিপ্ৰতা—সূর্যের প্রার্থ্যা যৌবনের সঙ্গে একযোগে চলে  
গেছে সর্দার!”

“দুর্ভাগ্য আমার—সে শৈশব দশনে বঞ্চিত হয়েছি; কিন্তু  
এখনো যে তেজোবহির প্রবাহ দেখছি,—তা আর কখনও ক্ষেপে  
নাই, কল্পমাতেও আনি নাই। আজ সেই কল্পনাভীত দৃষ্টি  
দেখে, হৃদয় এক স্বপ্নাবেশে বিভোর হয়ে উঠলো। বড় গর্ব  
ছিল আমার, যে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, অপরাধেয়। কিন্তু,  
তুমি আজ আমার সে গর্ব দূর করেছ। যার দুর্বল  
কারও অঙ্গপ্রহারে কখনও প্রতিহত হয় নাই, আজ তুমি  
সেই দুর্বলকে প্রতিহত করেছ—যার শক্তি উদ্বাপিতের মত

পড়ে এক একটা সোণার রাজত্বকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে, তুমি সে শক্তির—সে উদ্ধাপিণ্ডের দাহিকা শক্তি লোপ করেছ। রাজস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন অপরাজেয় দস্যু-সর্দার আজ তোমার নিকট জীবনে এই সর্বপ্রথম পরাজিত হলো—সর্বপ্রথম আজ তার জীবনের ইতিহাসে তার পলায়নের বিষয় কলঙ্কের অঙ্করে খোদিত হলো! তোমার অস্ত্র শিক্ষা আমার প্রাণকে ঈর্ষ্যায় উদ্বেলিত করে তুলেছে,—তোমার বীরত্ব-বহ্নি আমার শৌর্য-ব্যঙ্গক মুখকে লান করে দিয়েছে—তোমার রণকুশলতা আমার জীবনে একটা ঘৃণা এনে দিয়েছে, আমার শিক্ষায় অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে।

সার্থক! সার্থক তোমার জীবন, সার্থক তোমার রণশিক্ষা, সার্থক তোমার অস্ত্রধারণ। রাজস্থান এখন পাঠানের অস্ত্রাঘাতে অচেতন—নিদ্রিত। কেবল একমাত্র তুমিই বীরত্বের দ্বারে প্রহরীর মত জেগে আছ। রাজপুতের কনকপ্রদীপের হিরণ্যালোক, তুমিই উজ্জলিত করে রেখেছ। তুমিই এখন একমাত্র রাজস্থানের গরিমা-হার বীরত্বস্তুত। এ স্তুত ভঙ্গ করতে চাই না রাজা! দস্যু হলেও আমি রাজপুত, জাতির গৌরব চাই;—বীরত্বের পূজা চাই;—জন্মভূমির মঙ্গল চাই।

“সেই মাতৃভূমির শক্তি তুমি, মেরুদণ্ড তুমি; তোমায় সংহার করতে চাই না রাজা! অস্ত্র-সংবরণ কর—বন্দিত্ব স্বীকার কর।”

“সশস্ত্র রাজপুত কখনও বন্দিত্ব স্বীকার করে না দস্যু!”

“রাজা! তোমার এই শ্রান্ত ক্লান্ত কয়েক শত সৈন্যমাত্র সহায়।

আর, আমার বহু অন্বশোভিত নবোত্তমশালী এই আড়াই হাজার সৈন্য উন্মুক্ত কৃপাণ করে তোমায় জালবন্ধ কেশরীর মত ঘিরে ফেলেছে। যখন ঐ সহস্র সহস্র উত্তোলিত কৃপাণ নিয়ে নাববে, তখন তোমার একটি সৈন্যকেও আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে না ;—দেখবে, দলিত তুণের গ্রায় বিমর্দিত হয়ে এই ধূলি-ধূসরিত-কঙ্করময় মৃত্তিকায় শুয়ে পড়েছে। তাই বলি, বৃথা প্রাণ হারাবে রাজা !”

“তুমি দম্ভ্য, তোমার জীবনে স্পৃহা থাকতে পারে, ভোগ-লিপ্সা জাগতে পারে,—কিন্তু আমার জীবনে স্পৃহা বা বা ভোগলিপ্সা নাই,—রণমৃত্যু ব্যতীত অন্য আকাজক্ষাও নাই,—বিধাতার চরণে অন্য কিছু চাইবারও নাই।”

“রাজা ! প্রবীণ তুমি, বয়সের মত ভেবে—চিন্তা করে কথা বলো। আর এ ঠিক তোমায় বন্দী করা নয়—৫০ লক্ষ টাকা মুক্তি-পণে তোমায় কিছুদিনের জন্ত আবদ্ধ করে রাখবো মাত্র। অর্থের জন্ত তুমি বিকানীয়ে পত্র লিখে দেবে, আমার অহুচরেরা সে পত্র বিকানীয়ে নিয়ে যাবে। বিকানীর প্রার্থিত অর্থ পাঠালেই তুমি মুক্ত হবে।”

“আর অর্থের পরিবর্তে যদি সৈন্য আদায় ?”

“সমগ্র রাজস্থানের শক্তিও আমার এ দুর্ব্যাহী ফুলগড় দুর্গের কিছুই করতে পারবে না। এমন কেউ নেই—এমন কোনও শক্তি নেই, যে আমার এই দুর্গ আক্রমণ করে, তোমায় উদ্ধার করবে। তাই বলি, বৃথা নরহত্যার—আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই।

বলিছে স্বীকার করে ৫০ লক্ষ টাকা মুক্তি-পণের পত্র লিখে দাও।”

“দহ্য! তোমার দুর্গও যেমন অপরাধেয়,—আমার গর্বও সেইরূপ অপরাধেয়! প্রাণ হারাবো—তথাপি গর্ব হারাবো না! ভেবেছো কি দহ্যপতি, ৫০ লক্ষ টাকা মূল্য দিয়ে ক্রয় করবো এই অকিঞ্চর প্রাণ? কখনও না—কখনও না! দহ্যর হস্তে পরাজিত জীবনও মরণতুল্য!—সে কলঙ্কময় মরণ বেছে নিতে পারবো না,—না, কখনই না! সৈন্যগণ! একবার নির্ঝাণোমুখ দীপশিখার মত জ্বলে ওঠো। এই শেষ একবার ক্ষিপ্ত সাগর-তরঙ্গের মত মেতে ওঠো। ঐ মরণ-সাগরোপরি মহামূল্য অমর সিংহাসন ভেসে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়,—ঐ মৃত্যু-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অমর সিংহাসন তুলে নাও। আজ তোমাদের মরণ নয়,—অমরত্ব লাভ। হৃদয়ের গাঢ় উল্লাসের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত করে শত্রুর শিরে শত-ফণা-বিস্তারী ভূজঙ্গের মত আপতিত হও—প্রকৃত বীরের মত নির্ভীকচিত্তে—সহাস্ত্রবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর—নশ্বর দেহের বিনিময়ে জগতে অবিনশ্বর কীৰ্ত্তি স্থাপন কর।”

রাজার উৎসাহপূর্ণ তেজোগর্ভবাক্য, সৈন্যগণের নির্ঝাণিত-প্রায় উদ্যম উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। তখন জনহুল ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—“জয় বিকানীর অধিপতি রাজা চন্দ্রনারায়ণ সোলাঙ্কির জয়!” সে গুরু-গভীর জয়-ধ্বনিতে পর্কিতকন্দের কাঁপাইয়া তুলিল, অমঙ্গল আশঙ্কায় সেই

১১৪নং আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

অসমসাহসিক দস্যুর হৃদয়ও বিকম্পিত হইল। মন্ত্রমুগ্ধবৎ উভয় দলই ক্ষণকাল পর্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইল। আবার— আবার সেই জয়ধ্বনি—জয় রাজা চন্দ্রনারায়ণের জয়! এ ত' স্বপ্ন নয়—ভ্রম নয়—এ যে প্রতিধ্বনি! দস্যু আর চিন্তার অবসর পাইল না। শত শত স্তম্ভাঙ্কিত অসি—সুতীক্ষ্ণ তীর সতেজে তাহার সৈন্যের উপর বারিধারার ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। দেবতার সাহায্য ভাবিয়া উল্লাসে বিকানীর-সৈন্য দস্যুসৈন্যের উপর ভীম-প্রভঞ্জন বেগে পতিত হইল।

এবার লাক্ষফুলান প্রমাদ গণিল—পশ্চাতে অদৃশ্য শত্রু-নিষ্কিপ্ত অবিরত তীর-ধারা, সম্মুখে কেশরিসম বিকানীর-সৈন্যের স্তম্ভাঙ্কিত অস্ত্র প্রহার, উভয় দিকে আক্রান্ত হইয়া সর্দিার ব্যতিব্যস্ত হইল। এদিকে দলে দলে তাহার সৈন্য ভুলুঙিত হইতে লাগিল। পলায়নেরও উপায় নাই—যে ক্ষুদ্র অরণ্যের মধ্য দিয়া পর্বতারোহণের গুপ্ত পথ, সেই অরণ্যেরই বৃক্ষোপরি শত্রু নিজ দেহ লুকাইয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে—তীর নিক্ষেপে পলে পলে তাহার সৈন্যসংখ্যা ক্ষয় করিতেছে।

দস্যু বুঝিল, এ অবস্থায় থাকিলে একটা প্রাণীরও রক্ষা নাই, সকলকেই একসঙ্গে এই যুদ্ধিকাতে শয়ন করিতে হইবে। আজ মহাবল পরাক্রান্ত মহা ধুরন্ধর লাক্ষফুলানের মৃত্যু, আজ তার সব অবসান! তাই কি? পর্বতবাসিনি পর্বতেশ্বরী! তাই কি? প্রভূত প্রতাপশালী রাজস্থানজয়ী লাক্ষফুলানের এই ভাবে মৃত্যুই কি অদৃষ্টলিখন, বিশ্বজননি? না, কখনই তা হ'তে

দেব না। তার পর স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি স্বীয় অগ্নিময় রক্তাভ নয়নদ্বয় কিরাইয়া উচ্চ দৃঢ় জ্বালাময় কণ্ঠে বলিল, “প্রিয় সৈন্যগণ ! বজ্রগণ! বৃথা এ ভাবে মদমত্ত মাতঙ্গের পদতলে বিমর্দিত তৃণগুল্মের মত বিনষ্ট না হ’য়ে ছোট ! ঐ তীর-ধারার মধ্য দিয়ে তীরেরই মত ছোট ! যদি একজনও বাঁচ, সেও ভাল ; সেই একজনই এ হত্যার পৈশাচিক প্রতিশোধ নেবে। ছোট ছোট ! বিলম্বে আমাদের অস্তিত্ত বিলয় হবে।”

সর্দারের বাক্যে দম্ভাসৈন্য ‘জয় মা ঈশানি !’ রবে প্রবল বাতায় ত্রায় অশ্ব ছুটাইল। বৃক্ষগির হইতে শত শত তীর নিক্ষিপ্ত হইয়া শত শত দম্ভাসৈন্য ভূশায়িত করিল। আন্তের হৃদয়বিদারক চীৎকারে পর্বততল কম্পিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু দম্ভাসৈন্যের কোনও দিকে দৃকপাত নাই, বাধ ভাঙ্গা প্রবাহের ন্যায় তাহারা ছুটিল—শবরাশি উল্জ্বল করিয়া ছুটিতে লাগিল। বৃক্ষকাণ্ডের আঘাতে, অশ্ব হইতে পতনে, পরস্পর সংঘাতে বহুসৈন্য আহত হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ তাহাদের কোনও বাধা বিস্ম না মানিয়া উপর দিয়াই দৌড়িতে লাগিল। পর্বতোপরি আরোহণপূর্বক দম্ভাপতি সৈন্য সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিল, আড়াই হাজার সৈন্যের মধ্যে আড়াই শত সৈন্যও জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে নাই। ক্ষোভে রোষে ত্রিস্রমাণ হইয়া পর্বত গায়ে অস্ত্র শস্ত্রাদি নিক্ষেপ পূর্বক ললাটের ঘর্ষ ঘোচন করিয়া সর্দার একবার শুধু উর্দ্ধ দিকে চাহিল।

অরণ্যমধ্য হইতে রাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, দুইটি তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক প্রভাতারুণবর্ণাভ অতি সুন্দর বীরবেশে শোভিত অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত তেজোগৌরবমণ্ডিত দুইটি যুবক অল্পমান দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাঁহারই দিকে আসিতেছে। বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া রাজা এক দৃষ্টে যুবকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সৈন্যগণ অতিমাত্র বিস্ময়ে নির্গিমেষ-নয়নে যুবকদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

রাজ-সন্নিকটে আনিয়া উভয় যুবকই তরবারি কোষোন্মুক্ত করতঃ রাজচরণ স্পর্শ করিয়া সম্মানে রাজাকে অভিবাদন করিলেন। আনন্দ-বিস্ময়-সংমিশ্রিত জড়িতকণ্ঠে রাজা বলিলেন, “কে তোমরা দেবরাজ ও দেব-সেনাপতির ন্যায় উদয় হ’য়ে আমাদের নিমজ্জমান ভাগ্যকে বাহুবলে রক্ষা করলে। কে তোমরা মহান্ উচ্চ প্রকৃতি উদার হৃদয় যুবকদ্বয়?”

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবাজী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সসম্মানে বিনয়পূর্ণ স্বরে বলিলেন,—

“মহারাজ! আমরা কোন উচ্চ অভিভাষণের যোগ্য নই। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে ভেসে যেতে যেতে এই পর্বতের নিকট এসে পড়ি, সহসা মুহুমূহঃ শঙ্খনাদ শ্রবণে অল্পবীক্ষণের সাহায্যে আপনাদের দেখতে পাই; তাই আমাদের জীবিত জলন্ত কীর্তিটিকে দম্ভ্য কবল হ’তে রক্ষা করতে উন্নতের ন্যায় ছুটে এসেছি। পূর্বে বুঝি নাই যে, এই সেই রাজস্থানের মহাশত্রু লাক্ষফুলানের ফুলারাগড়, আগে চিনি নাই যে, এই সেই লাক্ষফুলান;

যখন চিন্‌লুম, তখন তার শক্তি পরীক্ষার—সাহস দেখবার ইচ্ছা বলবতী হ'য়ে উঠল; কিন্তু আমার সৈন্যসংখ্যা সামান্য—অতি সামান্য—মাত্র দুই শত, এই অতিমাত্র সামান্য সৈন্য সহায়ে তার শক্তি পরীক্ষার্থ অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র,—তাই ঐ ক্ষুদ্র অরণ্যের বৃক্ষশিরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হই—ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু সে শুধু আমাদের স্পন্দনটিকে—রাজহানের গৌরব-রবিকে রক্ষা করতে। শত ধন্য আমরা, যে আজ আপনার প্রাণ-রক্ষায় সক্ষম হয়েছি।”

কৃতজ্ঞ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাজা বলিলেন, “তোমারা শুধু ধন্য নও, বরেন্য। তোমাদের এ অসম সাহসের তুলনা নাই, তোমাদের এ রাজভক্তির উপমা নাই, তোমাদের এ উপকারের বিনিময়ও নাই। যুবক! তোমাদের পরিচয় দানে আমার সনেহাকুল হৃদয়কে স্তম্ভ কর!”

পূর্ববৎ বিনীত অথচ একটু ক্ষুদ্র কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন,—  
“মহারাজ! আমাদের পরিচয়ে স্তম্ভী হবেন না আপনি, বরং আপনার ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হবে। তবে আমাদের এইমাত্র পরিচয় জেনে রাখুন যে, আমরা রাঠোর, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, উপস্থিত আমাদের অন্য পরিচয় নাই।”

“আছে। তোমাদের এই অতুল সাহস, নিজ জীবন উপেক্ষায় পর জীবন রক্ষা,—এই মহৎকার্য্যই তোমাদের মহত্বের পরিচয় ঘোষণা করছে। তোমাদের প্রতিভা-দৃষ্ট ললাট, বীরত্বমণ্ডিত বদন, তেজোদীপ্ত নয়ন, অসীমশক্তি-ব্যঞ্জক বাহ



তোমাদের অসামান্যতা ঘোষণা করছে। এই তোমাদের যথেষ্ট পরিচয়। আর অল্প পরিচয়েও তোমাদের প্রয়োজন নাই, তোমাদের পরিচয়,—তোমরা বিকানীর-রাজের প্রাণদাতা; এই পরিচয়ই তোমাদের চির অমর করে রাখবে। প্রাণদাতা যুবক, আজ থেকে বিকানীর-সিংহাসন, বিকানীর-অধিপতি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতার চির ঋণে আবদ্ধ রইলো, আর আজ থেকে বিকানীর পতির তুমিই প্রধান সেনাপতি।”

সসম্মুখে নতশিরে শিবাজী বলিলেন—

“এত করুণা! তবে শুভুন মহারাজ, আজ থেকে আমি আপনার দাস, আজ থেকে বাহুর এ শক্তি—এ প্রাণও আপনার।”

“আশীর্বাদ করি, জয়শ্রীতে মণ্ডিত হও। তোমাদের নাম কি যুবক?”

শিবাজীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ নীরব চিন্তাতে শিবাজী বলিলেন—

“ইনি আমার অগ্রজ—নাম সাগর সিংহ, আর এই দাস হত-ভাগ্যের নাম দৈবরী সিংহ।”

উত্তর সমাপ্ত না হইতেই দৈবরী সিংহ বলিলেন,—

“মহারাজ! এখানে আর অধিকক্ষণ রিলম্ব করা প্রেয়স্বর নয়। দস্যু লাক্ষ্মীলালের সৈন্য এক স্থানে থাকে না, রাজ-স্থানের প্রত্যেক উপত্যকায় বাস করে। ফুলগড়ে তার সৈন্য আর নাই; থাকলে, সে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আপনাকে

আক্রমণ করতো না। এখান থেকে পর্বতের ব্যবধান অনেকটা।  
তীর এতদূর আস্তে পারবে না সত্য, কিন্তু পলায়িত অবশিষ্ট  
সৈন্য নিয়ে ঐ অরণ্যের সহায়তায় যদি সে আমাদের প্রতি তীর  
বর্ষণ করে, তবে আমাদের উদ্ধারের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই  
বলি, মহারাজ ! এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করা উচিত।”

লালট কুণ্ঠিত করিয়া রাজা বলিলেন, “পলায়ন ! দৃশ্য ভয়ে  
পলায়ন !”

“পলায়ন করুন মহারাজ ! এ পলায়ন নয়, আত্মরক্ষার  
স্বাভাবিক ধর্ম। এ দুরারোহ পর্বতে আরোহণ করা আমাদের  
শক্তির বহির্ভূত, চেষ্টামাত্র। দৃশ্যের অলুচরণ ঐ পর্বতের উপর  
হ’তে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ ক’রে আমাদের এই সামান্য  
সৈন্য দলকে বিচূর্ণিত করে দেবে। আর এখানে বৃথা বিলম্বে  
অদৃশ্য নিক্ষিপ্ত শরে প্রাণবিসর্জনে বীরত্ব নয় মহারাজ, আত্মহত্যা।”

“বাঃ ! স্মরণ যুক্তি ! তুমি শুধু আমার সেনাপতি নও দেখছি,  
আমার মন্ত্রণাদাতা। এস বিধিপ্রেরিত, এস দেবতার শুভ  
আশীর্বাদ, আমার প্রাণদাতা, এস, বিকানীর-রাজা সাদরে  
তোমাদের আহ্বান করছে।”

রাজা অগ্রে, উভয় পাশ্বে ঈশ্বর সিংহ ও সাগরসিং এবং  
পশ্চাতে সৈন্যদল অশ্ব ছুটাইল।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

“এ কি ক’রছেন রাও ?”

“কি ক’রছি পূরবীলাল !”

“কি করছেন—তা আবার জিজ্ঞাসা ক’রছেন ?—মাহুষকে সহজ ভাষায় সরল স্বাভাবিক কণ্ঠে তা আবার জিজ্ঞাসা ক’রছেন ? পশুপক্ষীদের জিজ্ঞাসা করুন দেখি—কি করছেন, তারা সক্রমণ আর্জিনাদ করে উঠবে ; শূশ্রে ঐ নীল অধরকে জিজ্ঞাসা করুন দেখি, সে অট্টহাসি হেসে উঠবে ; অঙ্গস্পৃষ্ট এই বাতাসকে জিজ্ঞাসা করুন, সে হু হু শব্দে গর্জে উঠবে ! কি করছেন, তা কি আর বুঝতে পারছেন না রাও ? আপনার বহু সাধনালব্ধ পবিত্র আত্মাকে, একটা পুতিগন্ধময়, নরকের মধ্যে নিক্ষেপ করছেন, কলঙ্কের দ্বিতীয় হিমালয় সৃষ্টি করছেন, জাতির গৌরবকে অন্ধকারগর্ভে ডুবিয়ে দিচ্ছেন,—আর বেশী কি করবেন-রাও !”

অবজ্ঞাপূর্ণ মুহূ হাস্যে অনতিউচ্চকণ্ঠে বিকানীরের অগ্নে পরি-পুষ্ট বিকানীরের মৃত্তিকায় পরিরক্ষিত বিকানীর রাজ-শালক রাও মহীপতি বলিলেন—

“ভুল—ভুল বুঝেছ বন্ধু ! জাতির গৌরব ডুবিয়ে দিচ্ছিনি,—তুলছি । ভেবেছ কি পূরবীলাল—এক বৃক্ষের হৃদে স্বীয় ভগিনীকে অর্পণ করেছি ; শুধু সহোদরার নয়নে অশ্রু ছোটাতে ? না,—তা

নয়—তা নয় সখা ! ভগিনীর বিনিময়ে এই বিকানীরের সিংহাসন  
চাই—আর সে সিংহাসনের প্রধান কণ্টকদের সমূলে বিনষ্ট  
করতে চাই। তাই আমার এই কৌশল। তাই দস্যু-সর্দার  
লাক্ষফুলানকে বিকানীরে প্রবেশের গুপ্ত দ্বারের সন্ধান দিই।

—কিন্তু জানি না, কি উপায়ে সহকারী সেনাপতি রণেন্দ্র, দস্যুর  
আগমন জানতে পারে। ৫০০ মাত্র সৈন্য সহায়ে রণেন্দ্র  
সর্দারের পঞ্চ সহস্র সৈন্যের গতি স্বদীর্ঘ দুই খণ্টা কাল পর্য্যন্ত  
রুদ্ধ করে রাখে;—বীর বটে এই নবীন সেনাপতি। আর  
এই সময়ের মধ্যে প্রধান সেনাপতি বিক্রমসিংহ এক সহস্র  
সৈন্য সজ্জিত ক'রে, ভীমবলে শত্রুর শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।  
সেনাপতির অদ্ভুত অস্ত্র ও সৈন্যচালনায় লাক্ষফুলান অগ্রসর  
হ'তে পারলো না। কিছুক্ষণ যুদ্ধান্তে বিক্রমের বিক্রম শিথিল  
হয়ে পড়লো—মহোন্মাদে সর্দার কোষাগারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল,  
—এমন সময়ে এক অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন রাজা তিন সহস্র সৈন্য নিয়ে  
সর্দারের সৈন্যের উপর পূজাভূত বিপদজ্জ্বালের ত্রায় আপতিত  
হ'লেন; বিকানীরের অর্দ্ধেকের উপর সৈন্য ভুলুষ্ঠিত হ'লেও  
সর্দার বুদ্ধ রাজার সে অদম্য শক্তির সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারলে না,  
—পলায়ন করলে। বীরাবতার রাজাও—কি জানি কি মন্ত্র-  
শক্তিতে দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ক্রান্ত শ্রান্ত সৈন্য নিয়ে  
রাজার পশ্চাতে উভয় সেনাপতিও অস্থি ছুটালেন, আমারও  
সব কৌশল—সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলো। এখন একমাত্র আশা  
ভরসা সেনানায়ক অভয়সিংহ।”

“কি উদ্দেশ্য আপনার ব্যর্থ হ’লো ?”

“আমার উদ্দেশ্য ছিল—বিকানীরকে পদ্বু করা।”

“তাতে লাভ—?”

“লাভ—বিকানীরের সিংহাসন।”

“বিকানীরের সিংহাসন তো আপনারই—অপুত্রক রাজা পুত্রস্নেহে আপনাকে প্রতিপালন করেছেন—আপনার ভগিনী অথবা আপনিই তাঁর সিংহাসন পাবেন। এতে সন্দেহ কেন রাও ?”

“সন্দেহ অনেক কারণে আছে। ভগিনী অবশ্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী সত্য,—কিন্তু রাজার অবর্তমানে বিকানীর হয় তো রমণীর শাসন—রমণীর আজ্ঞা পালন করবে না; তারা প্রতিনিধি চাইবে—আর সে প্রতিনিধি হবে সেনাপতি অদ্বিতীয় বীর বিক্রমসিংহ—অথবা জনপ্রিয় ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রণেন্দ্রনারায়ণ। যদিও আমার পক্ষে প্রধান অমাত্য ও দু’ একজন সামন্তরাজ আছে, কিন্তু জনসাধারণ আমার পক্ষে আসবে না—কারণ আমি বিদেশী। তারপরে দ্বিতীয় কারণ—বিকানীর-রাজনন্দিনী তো আর চিরকাল অনুচা থাকবে না—বিবাহ তার হবেই, সুতরাং বিকানীর-রাজ-জামাতা, সিংহাসন তাগ ক’রে অরণ্যে তপস্তা করতে যাবে না। তৃতীয় কারণ—রাজা যদিও বা আমাকে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তথাপি অসীম শক্তিশালী স্বাধীনতাপ্রিয়,—বিকানীর-সন্তান বিক্রম, বিদেশী আমি আমার আজ্ঞা যে নতশিরে পালন করবে, এ অসম্ভব; তাই আমার সিংহাসনপ্রাপ্তির আশায় এত সন্দেহ—তাই আমি

সেই সব বাধা উন্মূলিত করতে কৃতসঙ্কল্প। ভেবেছিলুম,—  
দস্যুর আক্রমণে সেনাপতি বিক্রম ও রণেন্দ্র নিহত হবে, আমার  
প্রধান আশঙ্কাতুল উন্নতির অন্তরায় দু'টা দূরীভূত হবে, কিন্তু  
বিধি বিরূপ—আমার কল্পনা—কল্পনাই রয়ে গেল! আর যেটা  
কল্পনা করিনি—সেটাও হলো। এত দিন পরে—এই জীবনের  
অন্তিমে—বুদ্ধ রাজা যে এক সামান্য দস্যুর বিরুদ্ধে নিজে অস্ত্র  
ধারণ করবেন, তা আমি কল্পনাও করিনি। বুদ্ধ রাজার উৎসাহে  
তাকে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করতে দেখে সৈন্তেরা মেতে উঠল,  
নতুবা—আজ বোধ হয় বিক্রমের বিক্রম চূর্ণ হ'য়ে যেত—দস্যুর  
পদতলে বিমর্দিত হ'ত। তাই ব'লে আশা ত্যাগ করিনি—  
করবোও না। বিফলতা আমার আরও উত্তম—আরও প্রতিহিংসা  
জাগিয়ে দিয়েছে; এই নূতন কৌশল যদি অভয় সম্পন্ন করতে  
পারে—তবে এই কৌশলেই বিকানীর-সিংহাসন করায়ত্ত  
করবোই করবো, এ স্থির জেন' সখা। এতে যদি বিকানীর-  
রাজের প্রাণ সংহার করতেও হয়, করবো,—ফিরবো না। যে  
পিছনে দেখে, উপরে তাকায়, সে কখনও কোন অসমসাহসিক  
কার্যে ফললাভ করতে বা জীবনে উন্নতি করতে পারে না।”

সহসা রাজপথে অশ্বপদধ্বনি উথিত হইল। শশব্যস্তে উন্মুক্ত  
বাতায়নপথে আসিয়া রাও দেখিলেন, রাজপথের ধূলা  
উড়াইয়া এক যুবক রাজপ্রাসাদের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে।  
অশ্বারোহী কিঞ্চিৎ নিকটে আসিলে মহীপতি অশ্বারোহীকে  
চিনিতে পারিলেন;—সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—

“পুরবীলাল ! সে এসেছে ?”

“কে ?”

“অভয়কুমার !”

“অভয় যদি অভয় না এনে ভয় এনে থাকে ?—”

পুরবীলালের কথাটা মহীপতির কর্ণে প্রবেশ করিল না।

উৎকণ্ঠা-আশঙ্কা-সংমিশ্রিত কণ্ঠে মহীপতি বলিলেন,—

“অভয়ের কার্য-সফলতায় আমার জীবন-মরণ—উত্থান-পতন  
নির্ভর করছে।”

পুরবীলাল বলিলেন, “তাই বলছি, সে যদি অভয় না  
নিয়ে এসে ভয়ই এনে থাকে ?—”

হৃষপূর্ণ স্বরে মহীপতি বলিলেন, “পুরবীলাল ! পুরবীলাল !  
অভয় সফল হয়েছে।”

“অসুখান !”

“অসুখান নয়,—সত্য। ঐ দেখ, অশ্ব হ’তে গর্কোৎফুল্লভাবে  
অবতরণ ক’রে সে আমায় সহাস্যে অভিবাদন করলে।”

“করক !—অভয় কেন, সমগ্র বিকানীর—সমগ্র রাজস্থান  
আপনাকে ভক্তিপ্রফুল্লচিত্তে অভিবাদন করুক ! আমিও তাই  
চাই, তাই—প্রার্থনা করি। কিন্তু এই স্থগিত পথে—”

পুরবীলালের বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতেই ধর্ম্মাক্ত কলেবরে  
অভয় কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে বিশ্রামের কিছুমাত্র  
অবকাশ না দিয়া অতিমাত্র উৎকণ্ঠাকুলিত কণ্ঠে মহীপতি  
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সংবাদ অভয় !”

“সংবাদ শুভ। সফল আমাদের কৌশল। রাজা যেমন সেতু পার হলেন, আমরাও অমনি প্রোথিত লোহদণ্ড তুলে, শৃঙ্খল সহ সেতু ভাসিয়ে নিয়ে এসে এক পাহাড়ের অন্তরালে রক্ষা করলুম। তারই কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি নদীতীরে এসে উপস্থিত হ’য়ে সেতু নেই দেখে নদীবক্ষে বাষ্প প্রদানে উত্তত হ’লেন। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় দেখে উপস্থিত বুদ্ধিতে নিকটস্থ একটা বৃক্ষের অন্তরাল হ’তে উচ্চকণ্ঠে ব’লে উঠলুম, ‘সেনাপতি! বিকানীরে দক্ষ্য প্রচ্ছন্ন ছিল, তারা দুর্গ ও প্রাসাদ একযোগে আক্রমণ করেছে,—মহারাণী বিপন্ন, দুর্গ ভগ্ন প্রায়।’ কে কথটা বল্লো,—সত্য কি মিথ্যা,—সম্ভব কি অসম্ভব,—সে বিচারশক্তি সেনাপতির তখন ছিল না; তিনি বিকানীরের প্রান্তরপথে বাহিনী ফিরালেন—আমিও আমার অহুচরদিগকে পূর্ববৎ নদীবক্ষে সেতু ভাসিয়ে পশ্চাতে আসতে আদেশ দিয়ে একাই মনুষ্য-চলাচলের পথে অশ্ব ছুটালেম।”

সহাস্য-বদনে-গোপীসিংহ বলিলেন, “যোগ্য অহুচর তুমি আমার!—বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি!—এই নাও—উপস্থিত এই তোমার পুরস্কার—!”

স্বীয় কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার উন্মোচন করিয়া অভয়ের কণ্ঠে স্বহস্তে পরাইয়া দিয়া মহীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কত সৈন্যের অধিনায়ক তুমি?”

“পাঁচ শত।”

“রাজাকে বলে সহস্র সৈনিকের অধিনায়কের পদ তোমা



অচিরেই প্রদান ক'রব। তুমি ক্লান্ত শ্রান্ত, এখন বিশ্রাম করগে ;  
সময়াস্তরে আহ্বান ক'রব।”

বিনীতভাবে অভিবাদনাস্তে অভয় গ্রহণ করিল।

স্মিতমুখে পূরবীলালের প্রতি চাহিয়া গোপীসিংহ বলিলেন,  
“পূরবীলাল! এবার আমার সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্তী।  
শীঘ্রই বিকানীরের মণিময় রাজমুকুট আমারই মস্তকে শোভা  
পাবে।”

“কিন্তু আমি তো দেখছি, আপনি সে মুকুট ভেঙ্গে চূরে  
গুঁড়িয়ে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষুধিতব্যাত্রসম রক্ত-  
লোলুপ এক দস্যুর কবলে দুর্বল অসহায় বৃদ্ধ রাজাকে নিক্ষেপ  
করে, রাজার উদ্ধারার্থ যুদ্ধোত্তম সেনাপতিদ্বয়কে মিথ্যা কৌশল  
রচনায় বাধা দিয়ে—আপনার যে কি সিদ্ধিলাভ হ'ল, তা এই  
ক্ষণবুদ্ধি পূরবীলাল বুঝতে পারছে না।”

“কৌশল! কৌশল! একের কৌশল অপরে যদি বুঝতেই  
পারলে, তবে সে কৌশলের কোনই মূল্য নেই। শোন পূরবী-  
লাল! আমার ঐ কৌশলে অর্জুনের পাণ্ডপত অস্ত্র অপেক্ষাও  
ভীষণ!—যাক।—রাজা যখন দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, তখন  
ঊর্ধ্ব দুর্গে না গিয়ে ক্ষান্ত হবেন না, আর সে রাজহানজয়ী কৃতান্ত-  
রূপী দস্যুও রাজাকে সশরীরে ফিরতে দেবে বলে বিশ্বাস হয় না,  
মুষ্টিমেয় রাজদৈন্য দস্যুর গ্রহারে চিরনিদ্রায় অচেতন হবে।  
এদিকে আমিও রাজ্যময় প্রচার করবো, রাজাকে অপ্রস্তুত সৈন্তহীন  
অবস্থায় কালরূপী লাক্ষ্মীনারায়ণ কবলে পরিত্যাগ করে



বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিরা মধ্যপথ হতে ফিরে এসেছে। এ বাক্য শুনে রাজভক্ত নাগরিকেরা ক্ষেপে উঠে সেনাপতিদ্বয়কে হত্যা করবে—অন্ততঃ সিংহাসনে বসতে দেবে না। তখন আমার সিংহাসন অধিরোহণে বাধা প্রদানের কেউ থাকবে না। আর রাজা যদি অক্ষত দেহে প্রত্যাবর্তন করেন, তাতেও আমার বিশেষ ক্ষতি নেই। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সেনাপতিদ্বয় মৃত্যুদণ্ড বা চিরকারাবাস বা নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হবে। আর হয়তো বা বিকানীরের অসংখ্য সৈন্যের পরিচালনভার আমারই উপর অর্পিত হবে। রাজ্যের বল—সাহস—শক্তি—সৈন্যের কতৃৎ যদি আমি পাই, তখন রাজার অবর্তমানে আমার সিংহাসন অধিরোহণের পথে এসে কেউ দাঁড়াতে পারবে না—দাঁড়াতে সাহস করবে না। আর তুমি কি মনে ক'রেছ পুরবীলাল—এই এক মাত্র পথ অবলম্বনে একটা বিশাল সাধনালভ্য বিকানীর-সিংহাসনে বসতে যাচ্ছি?”

“আজ্ঞে না, আমি মনে কিছু করিনি, তবে ভাবছি।”

“কি ভাবছেন?”

“ভাবছি—অসম্ভব কথাটা হুটি হলো কেন?”

“হুটি হয়েছে দুর্বল কাপুরুষের জন্য—কর্মীর জন্য নয়। নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি শুধু অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ন্যায় অবস্থে জগতের এককোণে পড়ে থাকে; কেউ তার পানে ফিরেও চায় না। যাক, আমার আর বাক্যালাপের অবসর নেই, এখনই সৈন্য নিয়ে দস্যুর কুলগড় ভূর্গে যেতে হবে।”

“কেন?”

“ভগিনীর নিকট সেনাপতিদ্বয়ের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ করে রাজার সাহায্যার্থে দুর্গস্থ সমস্ত সৈন্য নিয়ে যাব। যদি রাজাকে সেখানে না দেখি, ভাল; লাক্ষফুলানকে বিকানীর আক্রমণে সৈন্যে প্রেরণ করব; অরক্ষিত—শক্তিহীন—সৈন্যহীন বিকানীর দস্যুপদতলে লুপ্তিত হবে। তারপর সৈন্যে আমি এসে বিকানীর দস্যুসৈন্য বিতাড়িত করে সিংহাসন অধিকার করব।”

“দস্যু আপনাকে গুরুদক্ষিণার মত সিংহাসনখানা দেবে কেন?”

“দস্যু দস্যুতাই জানে, রাজ্যচালনা জানে না। তাদের রাজ্য-লিপ্সাও নেই, অর্থ পেলেই তারা তুষ্ট;—রাজকোষের সমস্ত অর্থই লাক্ষফুলানকে দেবো। আর সে যদি বিকানীর অধিকার করে, আমিও তার ফুলগড় অধিকার করে বসব। ফুলগড় দুর্গ যার, সেই অজ্ঞেয়। দস্যুর ঝগড়া,—একটা বিরাট ঝগড়ার মত দশ দিক্ অন্ধকরে করে অতর্কিত অবস্থায় রাজ্যের বক্ষের উপর এসে পড়ে লুপ্ত করে নিয়ে চলে যায়—সমুখ যুদ্ধে পারে না। বিকানীর লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে আমি যখন তা’কে আক্রমণ করবো, তখন সে নতমস্তকে, সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।”

“আর যদি রাজাকে জীবিত দেখেন!”

“তা হলে রাজার উদ্ধারে এসেছি বলে দেশের কাছে যশ—

রাজার কাছে আদর, সম্মান পাব। রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদও পেতে পারি। এখন চলেম—”

“কোথায় ?”

“ভগিনীর নিকট—”

গোপীসিংহ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কম্পিত জড়িতকণ্ঠে পূরবীলাল বলিলেন, “একটু দাঁড়িয়ে যান রাও ?”

“কেন ?”

“এ স্থগিত পথ—এ স্থগিত কৌশল ত্যাগ করুন। এখনও—”

বাধা দিয়া গোপীসিংহ বলিলেন, “বিবেচনা যা করবার, তা বহু পূর্বেই করেছি পূরবীলাল ! আর নূতন কিছু বিবেচনা করবার নেই। আর এ স্থগিত পথ নয় সখা ! উন্নতির পথ স্থগিত হয় না। উন্নতির পথে বাধা বিঘ্ন এসে জন্মে অনেক, সেগুলো দলিত করা স্থগিত কার্য্য নয়। আজ বা কাল যখন আমি বিকানীর-সিংহাসনে বসবো, তখন লক্ষ লক্ষ নয় নারী আমার জয়ধ্বনি করবে—অনুগ্রহ প্রত্যাশায় যুক্তকরে দাঁড়িয়ে থাকবে—লক্ষ শাণিত রূপা আমার ইঙ্গিতে উত্তিত হবে ; তখন আর ঘৃণা অশ্রদ্ধা কিছু থাকবে না। ঘৃণা অশ্রদ্ধা, অক্ষম—অযোগ্য—অকর্ম্মণ্য লোকের উপরই পতিত হয়। বিদ্বান্, চরিত্রবান্ বহুগুণসম্পন্ন লোকের উপর অন্তরালে হলেও—প্রকাশ্যে অশ্রদ্ধার এক কণাও বিকাশ হয় না। সহস্র জন্ম ধরে শুধু আমি বিকানীর-রাজ-আলক এই গর্ব্বটুকু নিয়ে—কক্ষকোণে বসে থাকি, কিংবা দৈশ্বরাধনা করি, জগতের

কেউই আমার নাম জানবে না, কিন্তু হত্যার নৃত্যে—  
কৃষিরের তরঙ্গে কোটা শব স্তূপের উপরও যদি সিংহাসন স্থাপিত  
করতে পারি, তা হ'লে আমার নাম দিগন্তে প্রতিধ্বনিত  
হবে—জয়নাদে মেদিনী কেঁপে উঠবে। যেমন গজনির মামুদের  
নাম আজ বিশ্বব্যাপী। লুণ্ঠনকারী দস্যু হলেও ভারতজয়ী  
মহাবীর ব'লে তাঁর বিরাট কীর্তি সমস্ত ভারত জুড়ে ঘোষিত হচ্ছে।  
বল দেখি পূরবীলাল! সেই মৃতিমান্ বীরত্বের অবতারের নিকট  
মাথাটা নত হয়ে পড়ে না কি? কীর্তি—কীর্তি, সে উদ্ধে উঠে—  
শত সহস্র বিঘ্ন অপসারিত করে সে কেবল উদ্ধে উঠে; তা গজনির  
মামুদের কু-কীর্তিই হোক, আর সোমনাথ-রক্ষাকারী রাজপুত  
রাজগণের সু-কীর্তিই হোক, সে কীর্তি; ইতিহাস তার জয়  
ঘোষণা ক'রবেই ক'রবে।”

“তা আপনি কীর্তি অর্জন করুন। কিন্তু আমি আপনার  
বাল্যবন্ধু, একসঙ্গে খেলেছি—বেড়িয়েছি। আপনার এতটা  
উন্নতিতে আমার যে চোক টাটাচ্ছে!”

দ্বয় হান্তে করুণাব্যঞ্জক কণ্ঠে গোপীসিংহ বলিলেন,—

“ভয় নেই বন্ধু, তোমায় আমি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করবো।”

“আজ্ঞে আমি গরীবের ছেলে, অতটা গরম খাদ্য আমার  
হজম হবে না—আমায় বিদায় দিন।”

“কোথায় যাবে?”

“আমার সেই সুখশান্তিপূর্ণ, হিংসাহ্বেষ পরিবর্জিত ছুটিরে।”

“বাল্যবন্ধুকে ত্যাগ করতে চাও?”

“বাল্যবন্ধুকে ত্যাগ করতে চাই না, তবে আত্মীয় বধপ্রয়াসী বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে ত্যাগ করতে চাই।”

উত্তর শ্রবণে মহীপতি জলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

“উত্তম, কিন্তু তোমায় বিশ্বাস কি? তুমি যদি আমার সব কথা প্রকাশ করে দাও।”

“বিশ্বাস কি!—আমায় কি চেনো না রাও? জীবনে মিথ্যা বাক্য কখনও বলি নাই, তথাপি আজ আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য শপথ করে বলছি, আমি আপনার বিষয়ে যা জানি—যা শুনেছি, তা কখনও কারও নিকট প্রকাশ করবো না।”

“উত্তম, তুমি যেতে পার।”

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

“ভগ্নী—”

“কে ও, মহীপতি?”

“হাঁ—আমি।”

“এস, ভিতরে এস।”

ঈষৎ স্পন্দিত বক্ষে রাও মহীপতি—বিকানীর-রাজ্ঞী প্রতিভাময়ীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষটি অতি সুন্দর, অতীব মনোরম, মণিমুক্তাখচিত-নয়ন মনোহর নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যে সজ্জিত,—যেন সৌন্দর্য্যভরণকে

পরিপ্লাবিত। কক্ষ মধ্যে এক স্বর্ণ-খচিত মণিময় পালকে কুহুম-কোমল দুহু ফেননিভ শয্যাপরি বিকানীরের দ্বিতীয়া রাজ্ঞী রাও মহীপতির সহোদরা মহারাণী প্রতিভাময়ী স্বকীয় রূপলাবণ্যে, কক্ষস্থ সমুদয় সৌন্দর্য্যকে নিস্ত্রভ করিয়া অঙ্ক শায়িত ভাবে অবস্থিত।

রাণীর বয়স অধিক নয়,—পঞ্চবিংশ হইবে। তাঁহার পদ্ম-বিনিম্বিত-বদনমণ্ডলে—বালিকার সারল্য—শরৎকালীন জ্যোৎস্না তরঙ্গ উচ্ছলিত; তাঁহার ইন্দীবর তুল্য নীল আকর্ণ-বিশ্রাস্ত নয়নযুগলে সুষমা-রাশি ঢল ঢল করিতেছে; তাঁহার গণ্ডস্থল গোলাপের গ্রায় রক্তাভ, ভ্রমরকৃষ্ণ ঈষৎ কুঞ্চিত অলকদাম পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত। তিনি উপাধান অবলম্বনে বাম হস্তের উপরে স্থায় গ্রীবাদেশ রক্ষা করিয়া মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্য-প্রতিমার গ্রায় শোভা পাইতেছেন। মাদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে তাঁহার সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। সে সৌন্দর্য্য দর্শনে আকাজক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না; সাধ হয়, সারা জীবনটা সেই সজীব মাতৃমূর্ত্তির পদতলে বসিয়া সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যেই লীন হইয়া যাই। বাস্তবিক রাণী প্রতিভাময়ী যেন শাপভ্রষ্টা দেবী; নচেৎ নরলোকে একাধারে এতাদৃশ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ অসম্ভব।

কনিষ্ঠ সহোদর মহীপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সংবাদ মহীপতি?”

মনঃপ্রাণ-মুগ্ধকারী একটা মধুময় মৃদুল বাক্যে যেন কক্ষটা মাতিয়া উঠিল।

কাল্পনিক বিষাদপূর্ণ বদনে, বিষাদ জড়িতকণ্ঠে মহীপতি বলিলেন, “বড় দুঃসংবাদ ভগ্নি !”

রাণীর অশ্রুগু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠা-জ্বলিত আবেগ পূর্ণ কণ্ঠে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দুঃসংবাদ মহীপতি ?”

মহীপতি নীরবে মস্তক নত করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষাদচিহ্ন লক্ষিত হইল। তদর্শনে রাণী শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন ; যেন হেম তটিনী-বক্ষে তরঙ্গ উঠিল,— যেন পূর্ণ স্রবাস্তুর উদয়ে পুষ্পকলিকার ন্যায় কক্ষটীও হাসিয়া নাচিয়া সৌন্দর্য্য তরঙ্গে মাতিয়া উঠিল। আকুলতা-জড়িত কণ্ঠে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কি দুঃসংবাদ মহীপতি, শীঘ্র বল, শীঘ্র বল।”

কম্পিতস্বরে মহীপতি বলিলেন,—

“বিখ্যাসঘাতক সেনাপতি বিক্রমসিংহ ও রণেশ্বরনারায়ণ দস্যর পশ্চাৎ ধাবমান রাজাকে মধ্য পথে পরিত্যাগ করে দুর্গে চ’লে এসেছে। বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ কয়েক শত মাত্র আহত দুর্বল সৈন্য নিয়ে দস্যর পশ্চাতে ছুটেছেন। বোধ হয়, দস্যর দুর্গ আক্রমণ না ক’রে ক্ষান্ত হবেন না। আর তার সে ছুরারোহ দুর্ভেদ্য অসংখ্য সৈন্য-পরিবেষ্টিত দুর্গে সে যদি একবার রাজাকে পায়, তা হ’লে তা হ’লে ভগ্নী—”

“বাধা দিয়া রাণী বলিলেন, “তা হ’লে রাজস্থানের গৌরব-শুভ শতধা চূর্ণিত হয়ে ধূলায় লুটাবে, কেমন ? মহীপতি ! এ কি সম্ভব ? সেনাপতি বিক্রমসিংহ বিখ্যাসঘাতক, এ কি



সম্ভব ? যার করুণার আচ্ছাদনতলে সে আবাল্য বর্ধিত, যার অমৃতময় অঙ্গে তার দেহ—তার মেদমজ্জা গঠিত—পরিপুষ্ট, যার অসীম ঔদার্য্যে সে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত, সেই বিক্রম—সেই পুত্রসম—হৃদয়ের আনন্দতুল্য, বিকানীরের সগর্ভ পরিচয় সেই বিক্রমসিংহ বিশ্বাসঘাতক—এ কি সম্ভব ?”

“ভগ্নি ! জগতে কিছুই অসম্ভব নাই ।”

“ওঃ ! ধরিত্রি, তুমি প্রাণহীনা, অসাড় ! বাসুকি, তোমার শত ফণা প্রস্তুরে পরিণত হয়েছে বুঝি ! সূর্য্যদেব, তুমি এই কলিতে অকর্ষণ্য বিলাসী হয়ে পড়েছ বুঝি ! ধিক্ ধিক্ ! শত ধিক্ তোমায় বিধাতা ! আর তোমাকেও শত ধিক্ মহীপতি ! দস্যুর উন্নত শিরটাকে গুঁড়িয়ে না দিয়ে—তার সেই প্রস্তুর-ছুর্গ পর্ব্বতসহ জলাধিগর্ভে নিক্ষেপ না করে—তার গর্ভ—অস্তিত্ব পৃথিবীবক্ষ হ’তে বিলুপ্ত না ক’রে এই সংবাদ তুমি দিতে এসেছ, নবীন যুবক ? তুমি তো সংবাদ দিতে আসনি, তুমি এসেছ তোমার নিজেরই ভীকৃতার পরিচয় দিতে ।”

ভগ্নকণ্ঠে মহীপতি বলিলেন, “কি করবো ভগ্নি !”

রোষকণ্ঠে রাণী বলিলেন, “কি করবে, তা আবার জিজ্ঞাসা করছো ? কেন, তোমার বাহুর সব গ্রন্থিগুলো শিথিল হ’য়ে পড়েছে ? তেজ, গর্ভ, বীরত্ব—সব কি নীরব, নিঃস্পন্দ, নিদ্রিত হয়ে পড়েছে ? কার ওরসে উদ্ভূত তুমি, তা কি বিশ্বৃত হয়েছ মহীপতি ?”

“না ভগ্নি ! তা বিশ্বৃত হইনি, হবোও না ; কিন্তু আমি একা—”

“কেন বিকানীরের শক্তি কি লোপ পেয়েছে? রাজ্যে কি প্রজা নেই?—হুর্গে কি সৈন্য নেই?”

“আছে।”

“তবে?”

“সেনাপতি থাকতে তারা আমার আদেশ প্রতিপালন ক’রবে কেন?”

“আর আমি যদি আদেশ করি!”

“ভুলুষ্ঠিত মস্তকে অবশ্য তারা প্রতিপালন করবে।”

“উত্তম। তবে আমিই আদেশপত্র লিখে দিচ্ছি।”

“রাণী সেনাপতির নামে আদেশপত্র লিখিয়া মহীপতির হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, “যদি আমার আদেশ অমান্য ক’রে সেনাপতি সৈন্য না দেয়, তা হ’লে বলো,—তাকে রাজদ্রোহি অপরাধে বন্দী করাবো, বিকানীরের সমগ্র সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করবো; দেখবো—তারা সেনাপতিকে চায়, কি বিকানীরের রাজ্যকে চায়।”

তারা বিকানীরের রাজ্যের অবাধ্য নয়।”

“উত্তম। তবে যাও মহীপতি, হুর্গের সমস্ত সৈন্য নিয়ে প্রবল হুঙ্কারে ভীষণ গর্জনে দস্যুর হুর্গ আক্রমণ ক’রে—তার হুর্গ ভূমিসাৎ ক’রে—তার গর্ভ শতধা চূর্ণ করে—তার নাম পৃথিবী হ’তে লোপ করে দিয়ে এস। আর তা যদি না পায়, ফিরোনা—যদি বিকানীরের বীরত্বের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্বে ওড়াতে না পায়, তবে ফিরো না। শোন মহীপতি! আমি তোমায় চাই

না, আমি বিকানীর-সিংহাসন চাই না, আমি রাজাকেও চাই না, আমি চাই—অক্ষয় অব্যয় প্রতিষ্ঠাকে, আমি চাই, যুগান্তব্যাপী যুগান্তধ্বনিত কীর্তিকে,—আমি চাই, বিশ্বাকাশব্যাপী চিরোজ্জ্বল গৌরবকে ! যাও, শীঘ্র যাও !”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

“সেনাপতি বিক্রমসিংহ ।”

বিবাদ কালিমাচ্ছন্ন চিন্তাভারাক্রিষ্ট নয়নদ্বয় উন্নত করিয়া সেনাপতি বলিলেন, “কেন রাও ?”

“এই মুহূর্তে দুর্গস্থ সমস্ত সৈন্যদের সজ্জিত হতে আদেশ দাও ।”

সেনাপতির চিন্তাপূর্ণ নয়নে বিষম ক্ষুটিত হইল। তিনি সবিস্ময়ে রাওয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “সে কি ! সহসা এত সৈন্যের কি প্রয়োজন ?”

“সে কৈফিয়ৎ দিতে আমি তোমার কাছে বাধ্য নই, বিক্রম-সিংহ !”

“আমিও তোমার আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য নই, রাও !”

মহারাজার আদেশ পালনেও কি বাধ্য নও ?”

“মহারাজার আদেশ পালনে শুধু আমি কেন, সমগ্র বিকানীর-বাসী বাধ্য ।”

“তবে এই দেখ তাঁর লিখিত আদেশপত্র।”

মহীপতি মহারাণীর আদেশপত্রখানি সেনাপতির হস্তে প্রদান করিলেন।

সেনাপতি দেখিলেন, সত্যই তাহাতে লিখিত রহিয়াছে—

“সেনাপতি বিক্রমসিংহ! আমার সহোদর রাও মহীপতির কর্তৃত্বে তোমার সমস্ত সৈন্য বিনা বাক্যব্যয়ে অবিলম্বে প্রদান করিবে। আমার এই আদেশ অমান্য করিলে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তোমায় বন্দী করিব। ইতি—

বিকানীর-মহারাণী।”

পাঠান্তে ম্লান মুখে নিশ্বেজ কণ্ঠে সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে প্রয়োজন নেই?”

“না।”

“সেনাপতি রণেশ্বরনারায়ণকে?”

“না, আমার শুধু সৈন্যের প্রয়োজন।”

“উত্তম। মহারাণীর আদেশ এখনি প্রতিপালিত হবে। আমার পশ্চাতে আহ্নন।”

গাত্রোত্থান করিয়া সেনাপতি ধীর পদক্ষেপে সোপানাতিক্রম-পূর্বক দুর্গ-চত্বরে আসিয়া তূর্য্যধ্বনি করিলেন; মুহূর্ত্তে দুর্গ-চত্বর সৈন্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে তূর্য্যনাদ রণেশ্বরের কর্ণেও বাজিয়াছিল। তিনি সত্বর আসিয়া বিক্রমসিংহ ও মহীপতির পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন।

দুরোখিত জীমূত-গর্জনের ন্যায় ধীর গম্ভীর কণ্ঠে সেনাপতি

বিক্রমসিংহ সমবেত সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এখনই তোমরা অন্তঃস্থে সজ্জিত হও। কোথায় যেতে হবে—কেন যেতে হবে,—তা আমি জানি না। এই রাজ-স্থালক রাও বাহাদুরই আজ হতে তোমাদের পরিচালক। আজ হতে আমি আর তোমাদের কেহ নই,—আর এ আদেশও আমার নয়, মহারাজার আদেশ। আশা করি, এ আদেশ পালনে তোমরা কেহই অসম্মত হবে না।”

সৈন্যগণ বিস্মিতভাবে নীরবে নতশিরে দণ্ডায়মান রহিল। তদর্শনে রাও মহীপতি তীব্র, উগ্র অথচ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,

“বিকানীর-জননীর প্রিয় সৈন্যগণ! বিলম্বের অবসর নেই—যাও, সত্ত্বর প্রস্তুত হওগে;—এ তোমাদের জননীর আজ্ঞা!”

কাতর নয়নে একবার সেনাপতির মুখপানে নীরবে চাহিয়া ভক্তি-অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সকলে প্রস্থান করিল।

সেনাপতি বিক্রমসিংহও নীরব নিষ্পন্দভাবে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কপ করিয়া চিত্র পুত্তলিকাপ্রায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

মুহূর্ত্তের রণেন্দ্রনারায়ণ ডাকিলেন, “সেনাপতি!”

চমকিত হইয়া সেনাপতি বলিলেন, “কে ও?”

“আমি রণেন্দ্রনারায়ণ—”

“কি বলছেন রণেন্দ্র?”

“সেনাপতি! আজ এ কি হ’ল? নিয়মের পরিবর্তে অনিয়মের আবির্ভাব হ’ল কেন? শৃঙ্খলার সুখময় রাজ্যে বিশৃঙ্খলা এসে

আধিপত্য বিস্তার করলে কেন? কোন্ অপরাধে আজ এই ব্যতিক্রম?”

“জানি না রণেন্দ্র, কোন্ গুরু অপরাধে এই অনিয়ম—কোন্ মহাপাপে আজ এই শাস্তি—এই মৃত্যুতুল্য অপমান।”

শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে মহীপতি বলিলেন, “কোন্ অপরাধে—কোন্ মহাপাপে এই অনিয়ম—এই অপমান, তা কি জান না সেনাপতি?”

“জ্ঞানতঃ কখনও কোনও পাপ—কোনও অপরাধ তো করিনি রাও। তবে,—তবে আজ কেন এমন হলো? জান তো বল রাও, হৃদয় শোধিতে সে পাপ ধোত করে ফেলবো—প্রাণ দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। কি সে গুরু অপরাধ?”

“ঠিক বলছো?—ঠিক বলছো? রাজপুত হ’য়ে—বীর হ’য়ে ঠিক বলছো?—হৃদয়-শোধিতে সে পাপ ধোত করবে?”

“রাজপুত কখনও মিথ্যা বলে না রাও! বিক্রমসিংহ বিকানীরের সন্তান—পুরুষ!”

“তবে শোন সেনাপতি, স্থির হ’য়ে শোন, তুমিও শোন রণেন্দ্র—তোমরা বিকানীর রাজ্যের দুইটা লৌহস্তম্ভ। তোমরা—তোমরাই এই অনিয়মকে আহ্বান করে এনেছ, শাস্তির বন্ধে পদাঘাত করেছ। শত জন্মের হৃদয়-শোধিতেও—সহস্র কল্পের আকুল সাধনাতেও সে পাপ ক্ষালিত হবে না,—মাফ্য বা বিধাতা কেউ তোমাদের ক্ষমা করবে না। তোমরা বিকানীরের শত্রু—রাজার শত্রু—তোমরা রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক।”

সশব্দে উভয়ের কোষ নিম্মুক্ত অসি উদ্ধে উখিত হইল।  
ক্রোধ সংবরণ করিয়া সেনাপতি বলিলেন, “না, তোমায় হত্যা  
করবো না, তুমি ‘যে রাজ-শালক ; তবে এই মুহূর্ত্তে তোমার  
বাক্য প্রত্যাহার কর রাও, নতুবা—”

“নতুবা কি সেনাপতি ? নতুবা তোমায় বন্দী করবো ?—  
আমি নিরস্ত্র বা বালক নই, সেটা বিস্মরণ হয়ো না বিক্রম !  
আর এও স্মরণ রেখ’—দুর্গস্থ সমস্ত সৈন্য এখন আমার  
আজ্ঞাধীন।”

“সে আমারই আদেশে। আবার আমারই আদেশে তারা  
এই মুহূর্ত্তে তোমায় বন্দী করবে ; তারা আমায় এত ভালবাসে,  
এত মান্য করে।”

সহসা পশ্চাৎ হইতে গুরুগম্ভীর বর্ষে ধ্বনিত হইল,—“আর  
তারা—তোমার চেয়েও আর এক জনকে বেশী মান্য করে  
সেনাপতি !”

সচকিতে সকলে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন—রাজা ও তাঁহার  
উভয় পার্শ্বে প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী দুইটা যুবক।

সবিস্ময়ে সকলেই নীরবে—আলোড়িত-হৃদয়ে স্থিরনেত্রে  
চাহিয়া রহিলেন ; কোন প্রশ্ন বা অভিবাদন করিতেও বিস্মৃত  
হইলেন।

বিকানীর-পতি অগ্রসর হইয়া জলদনিঃস্বনে বলিলেন—

“সেনাপতি ! আমার বাক্য সত্য কি না যদি প্রত্যক্ষ দেখতে  
না চাও ; তবে উভয়েই এই মুহূর্ত্তে অস্ত্র ত্যাগ কর।”

রাজার বাক্যে উভয় সেনাপতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ।

পুনরায় উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন, “বিক্রমসিংহ ও রণেন্দ্র-নারায়ণ এই দণ্ডে আমার আদেশপ্রতিপালন না করলে সামান্য সৈনিকের দ্বারা অপমানিত হবে, কিন্তু ভূতপূর্ব বিকানীর-সেনাপতিদ্বয়কে অপমান করবার ইচ্ছা নাই, তাই আবার বলছি—এই মুহূর্তে অস্ত্রত্যাগ কর!”

বিক্রমসিংহের বদন যেন ঘন ক্রুদ্ধ মেঘে আচ্ছন্ন হইল । মহীপতির বদনে সকলের অলক্ষ্যে একটা মৃদুহাস্যহিল্লোল বহিদ্রা গেল ।

হতবুদ্ধি সেনাপতি বিক্রমসিংহ সবিষ্ময়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “কোন্ অপরাধে মহারাজ?”

“সরল বালকের মত এ প্রশ্ন করতে পারছো সেনাপতি! আশ্চর্য্য, জগতে যে যত পাপী, সে লোকের কাছে তত সরল সাজে।”

বেশ একটা লোমহর্ষণকর উপাখ্যানের মত—ঘটনাটী গাঢ় ভাবে এঁকেছিল, কিন্তু আরম্ভেই থেই হারিয়ে ফেল্লে । যে তোমার পালক, রক্ষক—তোমার রাজা, তাকে সাক্ষাৎ শমনের কবলে অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ ক’রে আসতে তোমার বিবেক আর্ন্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো না! ভেবেছিলে—আমি আর ফিরবো না; তখন তুমি হবে বিকানীরের রাজা—আর চক্রীর সহকারী রণেন্দ্র হবে মন্ত্রী! কেমন? ভেবেছিলে—তোমার



সমকক্ষ বিকানীরে আর কেউ নেই ! রাণী তো রমণী । কিন্তু  
ব্রাতা যদি ভগ্নীর নাম ক'রে প্রজার ঘারে সাহায্য চায়, রাজভক্ত  
প্রজা হৃদয়ের শোণিত পর্য্যন্ত দান ক'রবে—তাই আমার  
আত্মীয়ের মস্তকে খড়্গ তুলেছিলে । এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখবো  
বলেই নিশ্চয় এসেছিলুম । সেনাপতি, চমৎকার দৃশ্য দেখালে,—  
এমন বীভৎস দৃশ্য বিকানীর কখনও দেখেনি—কখনও স্বপ্নেও  
ভাবেনি ! তুমি একটি সাক্ষাৎ সয়তান । শোন সেনাপতি,  
তোমায় শিশুকাল হ'তে স্নেহরস সেচনে পরিবর্দ্ধিত করেছি ;—  
স্নেহভরে বক্ষের আচ্ছাদনে তোমায় ঘিরে রেখেছিলুম, হৃদয়ের  
অতি নিভৃত প্রদেশে অতি সংগোপনে আদরে তোমায় লুকিয়ে  
রেখেছিলুম, তাই প্রাণদণ্ড তোমার অমার্জনীয় গুরু অপরাধের  
উপযুক্ত হলেও—আমি তোমায় নির্বাসনদণ্ড প্রদান করলেম ।”

নিঃস্পন্দ নয়নে বিষ্ময়িত-মস্তকে সেনাপতি বিক্রমসিংহ  
কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের জ্বায়ে ধূলায় বসিয়া পড়িলেন । শত্রুর শত  
অব্রাঘাতেও যিনি কম্পিত বা বিচলিত হন নাই, সেই সেনাপতির  
হৃদয়, দেহ, মন—রাজার বাক্যে বিকম্পিত ও বিচলিত হইয়া  
উঠিল ।

অনন্তর রাজা রণেন্দ্রনারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

“তুমি সহকারী সেনাপতি । এই রাজপ্রৌহিত্যপূর্ণ যড়যন্ত্রের  
সেনাপতির সহকারিত্ব করতে জ্ঞাতি কর নাই । তুমিও এই  
যড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ । স্বতরাং তুমি দণ্ড্য, তোমাকেও  
সমানদণ্ডে দণ্ডিত করলুম ।”

রাজার বাক্যাবসানে মহীপতি বংশীধ্বনি করিলেন, অমনি দুর্গ-চত্বর সহস্র সহস্র সৈনিকে পরিপূর্ণ হইল।

সবিস্ময়ে রাজা ভিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সৈন্তসঙ্খ্য কেন মহীপতি?”

“আপনার সাহায্যের জন্ত। সেনাপতি সৈন্ত না দেওয়ায় রাণীর লিখিত আদেশপত্র নিয়ে—রাণীর নামে সৈন্যদের আহ্বান করে আপনার সাহায্যে যাচ্ছিলুম—”

“তোমার মত আত্মীয় যেন জন্মে জন্মে পাই।”

তার পর ঈশ্বর সিংহের হস্ত ধারণপূর্বক সমবেত সৈন্যগণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন, “সৈন্তগণ! আমার প্রাণ—শুধু আমার প্রাণ কেন—এই যুবকই দস্যু-সর্দার লাক্ষ-ফুলানের শক্তি প্রতিহত করে, দস্যুকবল হ’তে—চক্রীর চক্র হতে—বিকানীর সিংহাসন রক্ষা করেছেন! সেই কার্যের পুরস্কারস্বরূপ আমি এই মধ্যাহ্ন-ভাঙ্গরসম ভোজো-বীৰ্য্যশালী বীরকে বিকানীরের প্রধান সেনাপতির পদে বরিত করেছি। আজ থেকে এই রাঠোর বীর ঈশ্বরী সিংহই তোমাদের প্রধান সেনাপতি। যদি আমার প্রতি ভক্তি থাকে, তবে আশা করি তোমরা আমার আদেশে সহর্বে এই যুবক ঈশ্বরী সিংহকেই তোমাদের পরিচালক ব’লে গ্রহণ করবে।”

অমনি শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “জয় মহারাজ বিকানীর পতির জয়! জয় ঈশ্বর সিংহের জয়!”

রাজা সহর্ষে বলিলেন, “সন্তুষ্ট হলাম। যাও, এখন তোমরা  
রণবেশ ত্যাগ ক’রে বিশ্রাম করগে।”

মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্গচত্বর সৈন্তশূন্য হইল।

অনন্তর মহীপতিকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন,—

“যাও মহীপতি! আমার আগমনবার্ত্তা রাজপ্রসাদে ঘোষণা  
করগে।”

“হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে হাস্যস্ফুরিত বদনে মহীপতি দ্রুতপদক্ষেপে  
প্রস্থান করিলেন।”

তখন সেনাপতিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন,—

“তোমরা চুপটি ক’রে শান্ত শিষ্ট, নিরীহ ভাল মানুষের মত  
দাঁড়িয়ে রইলে যে? তব্বর ধৃত হলেই সে তখন নিজেকে একটা  
অতি অপদার্থ অকর্ম্মণ্য নিকোঁধ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে।  
তোমরাও দেখছি অতি সুন্দর অভিনেতা—সেইরূপ অভিনয়  
প্রদর্শন করছ! কিন্তু বুখা সে অভিনয়ে মুগ্ধ করতে পারবে  
না! শোন সেনাপতি, সূর্য্যাস্তের পরও যদি তোমাদের  
বিকানীর মধ্যে দেখি, তবে স্থির জেন, তোমাদের জীবনও  
সূর্য্যাস্তের সঙ্গে অন্তিমিত হবে।

রাজা প্রস্থানোত্তত হইলেন।

সহসা সেনাপতি রণেন্দ্র নারায়ণ আসিয়া রাজার সম্মুখে  
দণ্ডায়মান হইলেন।

তদর্শনে গভীর স্বরে রাজা বলিলেন, “পথ ছাড় রণেন্দ্র!”

অতীব কাতরভাবে রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “মহারাজ!

একটা কথা—ভূতোর এই শেষ একটা কথা শুনে যান। আমরা বিশ্বাসঘাতক নই, অপরাধী নই, নদীবক্ষে—” বাধা দিয়া রাজা বলিলেন, “তোমার বুথা বাজে কৈফিয়ৎ. শোনবার আমার অবসর নেই। একটা পাপ লুকাতে অনেক পাপের সৃষ্টি করোনা রণেন্দ্র!—শত মিথ্যার আবরণে পবিত্র সত্যকে আবৃত করার বুথা চেষ্টা করোনা।”

বেদনাপূর্ণ স্বরে সজল নয়নে রণেন্দ্র বলিলেন, “শুনলেন না! তবে এই নিন্ মহারাজ! আপনার প্রদত্ত অসি আপনার চরণে রক্ষা করে, আপনার আদেশ অবনত শিরে গ্রহণ করলুম।

তবে আসি মহারাজ! এই শেষ দেখা। যদি কখনও একলঙ্ক-কালিমা ললাট হতে ধোত করতে পারি, তবেই বিকানৌরে এসে মুখ দেখাবো, নতুবা এই শেষ দেখা।”

রাজচরণে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক স্থলিত পদে প্রণাম করিয়া রণেন্দ্রনারায়ণ চলিয়া গেলেন।

রাজা পুনরায় অগ্রসর হইলেন; এগন সময়ে পশ্চাৎ হইতে শব্দ হইল—“মহারাজ!”

রাজা দাঁড়াইলেন। বলিলেন, “তোমার আবার কিছু কৈফিয়ৎ আছে নাকি বিক্রম? দেখছি তোমরা খুব প্রত্যাশমন্মতি।”

রুদ্ধ অথচ গম্ভীরকণ্ঠে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, “না মহারাজ, কৈফিয়ৎ আমার কিছুই নেই—আমার কৈফিয়ৎ—ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে একদিন না একদিন পাবেনই; নচেৎ

আমার কৈফিয়ৎ নেই। এই নিন্ আপনায়, বহুশত্রু-শোণিত-  
সিক্ত তরবারী, এই নিন্ সেনাপতির শিরোপা-অঙ্কিত শিরস্ত্রাণ,  
আজ থেকে আমি আর এ দুর্গে প্রবেশ করবো না। কিন্তু  
মহারাজ !”

“কিন্তু কি ?”

“কিন্তু আমি বিকানীর ত্যাগ করতে পারবো না; আমার  
জন্মভূমি—আমার গৌরব-রাণী কীর্তিকিরীটিনী—আমার জননী  
বিকানীরকে ত্যাগ করতে পারবো না, না—না কিছুতেই নয়।  
মরতে হয়, আমার গর্ভের বিকানীরের বক্ষে—জন্মভূমির ক্রোড়ে—  
স্বর্গ অপেক্ষা মহিমময়ী—গৌরব-গীতিময়ী বিকানীরের মৃত্তিকায়  
শুয়ে মরবো, তথাপি বিকানীরকে ত্যাগ করে আমি কোথাও  
যেতে পারবো না। বিকানীরের পূণ্য-পীযুষধারায়, বিকানীরের  
শ্যামল-তৃণ-দলোপরি, বিকানীরের সুসমামণ্ডিতা সৌন্দর্য্য-  
বিতুষিতা আকাশতলে যে দেহ বর্জিত, সে দেহের অবসানও সেই  
খানে হোক।”

“বিশ্বাসঘাতকের আবার মাতৃভক্তি—দেশপ্রীতি ! বিধাতার  
চমৎকার সৃষ্টি ভূমি ! শোন সেনাপতি, তোমার প্রতি অগাধ  
বিশ্বাস, অনাবিল স্নেহ, অপার করুণা ছিল, তাই তোমার  
মৃত্যু ইচ্ছা করি না। স্থিরচিত্তে চিন্তার জন্য তোমার সপ্তাহকাল  
সময় দিলুম। আমার আদেশ পালন কিম্বা মৃত্যুকে বরণ—  
যা অভিরুচি, বেছে নিও।”

“উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রাজা প্রস্থান করিলেন।”

### সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

“এ কার জয়ধ্বনি !”

“ঈশ্বরী সিংহের ।”

“কে সে ?”

“বিকানীর নবীন সেনাপতি ।”

বিষয়বাক্যককণ্ঠে রাণী বলিলেন, “কে তাকে নিয়োগ করলে ?”

“রাজা স্বয়ং ।”

“রাজা ! কোথায় তিনি ?”

“দূর্গে ।”

“রাজা প্রত্যাবর্তন করেছেন ?”

“হাঁ ভগ্নি !”

“রাজা ফিরে এসেছেন, অথচ বিকানীরে আনন্দহিলোল নেই, আকাশ-প্রতিধাতী জয়ধ্বনি নেই ! আশ্চর্য্য ! না মহীপতি, রাজা প্রত্যাবর্তন করেন নি, তা হ’লে বিকানীর জড়ের মত নীরব থাকতো না । তুমি ভুল শুনেছ মহীপতি,—”

“আমি শুনি নি ভগ্নি, নিজের চক্ষে দেখেছি । সেনাপতি বিক্রমসিংহ তোমার আদেশ সঙ্গেও সৈন্য প্রদানে অসম্মত হওয়ায়, তার সঙ্গে বচসা হয় । যড়যন্ত্রকারী বিক্রম যখন আমার হত্যায় উদ্যত হয়, ঠিক সেই সময়ে রাজা ও ঈশ্বরীসিংহ উপস্থিত হন । সেনাপতির কার্য্যকলাপ ও রাজ্যের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য এবং শত্রুকে আত্মগোপনের অবকাশ না দিবার

উদ্দেশ্যে রাজা নীরবে নিঃশব্দে আগমন করেন। অনন্তর সেনাপতি ও সহকারী-সেনাপতিকে নির্বাসিত ক'রে—রাজা—  
“ঈশ্বরী সিংহকে প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করেন।”

“কে এই ঈশ্বরী সিংহ?”

“তা জানি না ভগ্নি, সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবে সে বিকানীর-  
বাসী নয়, রাঠোর।”

“এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশী রাঠোর যুবক, বিকানীরের  
প্রধান সেনাপতি—তার কারণ?”

“তার কারণ, রাজা বলেন,—তার কারণ সেই যুবক ঈশ্বরী  
সিংহ নাকি দস্যু-কবল হ'তে তাঁকে উদ্ধার করেছে।”

“তা হ'লে সে রাজার জীবনরক্ষাকারী; অপরাধেয় দস্যু  
লাক্ষফুলানের গুরু-খরসকারী! রাজা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই  
সেনাপতির পদ প্রদান করেছেন।”

“না ভগ্নি! সে যতই কেন বীরযোদ্ধা বা উপযুক্ত উপকারী  
হউক না, তথাপি সে অপরিচিত অজ্ঞাতচরিত্র বিদেশী, প্রধান  
সেনাপতির পদ অর্থাৎ রাজ্যের শাসন-রজ্জু তার হাতে ছেড়ে দেওয়া  
ঠিক হয় নাই। পুরস্কারের কি অন্য পছা ছিল না? রাজা কোষাগার  
তাকে দিতে পারতেন, স্ববৃহৎ একটা জায়গীর দিতে পারতেন!  
আর এ রাজ্যে কি অন্য কেউ সেনাপতি হবার উপযুক্ত ব্যক্তি  
নেই? আমার বাহু কি দুর্বল?”

“তুমি ঠিক বলেছ। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদ্বয়কে নির্বাসিত  
করে রাজা যেমন বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি

এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে এতটা বিশ্বাস করে অদূরদর্শিতার কার্য করেছেন। তোমাকেই তাঁর সেনাপতিপদ প্রদান করা একান্ত কর্তব্য ছিল।”

সহানুভূতি পাইয়া সোৎসাহে মহীপতি বলিলেন, “বলতো ভগ্নি! তা না করে—রাজা এক পথের ভিক্ষুক এনে, বিকানীরের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসালেন। যদি রাজ্যের মঙ্গল চাও রাজার মঙ্গল চাও—তবে এখনও রাজাকে ফেরাও তগ্নী, এখনও সময় আছে—উপায় আছে। কিন্তু একবার যদি সে সৈন্যদলের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে,—যদি একবার কোনও মতে জনপ্রিয় হ’তে পারে, তখন তাকে আর নড়ান যাবে না। তখন সে দুর্বল রাজার শিথিল মুষ্টি হতে সমগ্র বিকানীরের শাসনভার বলপূর্বক কেড়ে নিলেও নিতে পারে।”

“কিন্তু বিকানীরের রাজা এখনও এতটা দুর্বল হয়নি মহীপতি!”

চমকিত হইয়া মহীপতি দেখিলেন—তাহার বাক্যের উত্তর-দাতা, স্বয়ং রাজা!

রাজা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “মহীপতি! বিকানীরের রাজা তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক বুদ্ধি কোশল, শক্তি সামর্থ্য ধারণ করে! রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করা রাজার কর্তব্য! তোমার নয়। যাও, নিজের কার্য করগে।”

সম্ভ্রান্ত কম্পিত হৃদয়ে ভগিনীর প্রতি একবার নীরবে চাহিয়া ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে মহীপতি প্রস্থান করিলেন।



রাণীর কিন্তু রাজার বাক্যে বা মহীপতির দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার বদন অত্যুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে উজ্জ্বলিত, অনাবিল বিরাট আনন্দে হৃদয় বিলোড়িত; তিনি শুধু বিমুগ্ধ অচঞ্চল নয়নে রাজার দিকে চাহিয়াছিলেন। মহীপতি প্রশ্নান করিলে মুগ্ধ জড়িত প্রেমান্বিত কণ্ঠে মৃদু স্বাক্ষরে বলিলেন,—  
“এসেছ!”

কথাটি ক্ষুদ্র হলেও রাজার নিকট তাহা অসংখ্য, বৃহৎ ও অমৃতময় বলিয়া মনে হইল। উদার সরল হস্তে প্রীতি-মিষ্ট স্বরে রাজা বলিলেন, “আমি তো আসিনি রাণি, তুমিই আমার এনেছ!”

আনন্দে রাণীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল। তিনি গদগদস্বরে বলিলেন, “তুমি তো আর আমার খাতক নও মহারাজ!—তুমি আমার মহাজন। তোমায় আমি ধর পাকড় করে আনব কেমন করে?”

“প্রেমের ক্ষেত্রে খাতক-মহাজন নাই। এক্ষেত্রে—পরস্পর পরস্পরের মহাজন! কেহই খাতক নয়! এ মহাজন কেবল স্বেচ্ছায় দিবেই যায়! ইহলোক বা পরলোকে যেখানেই থাকুক না কেন, সেইখানেই তার নিকটে অবাচিত প্রেম পাঠিয়ে দিবে ব্যাকুল সাধনায় তাকে আকর্ষণ করে! সুতরাং তুমিও আমার মহাজন! আমার প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করে, শমনের প্রসারিত বাহু থেকে টেনে এনেছ।

প্রেমময়ি! তুমিই যে আমার উৎসাহের উৎস, আমার

জীবনের উপাদান, আমার আনন্দ, আমার শাস্তি—বিকানীরের রাজলক্ষ্মী যে তুমিই !”

লজ্জারক্তিমবদনে রাণী রাজার যোদ্ধাবেশগুলি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “নাও, এখন এই জবরজং বোঝাগুলো খুলে ফেলে দেহটাকে হাঙ্কা কর ।”

“কি রকম ক’রে এ সব খুলতে হয়, তা যে ভুলে গিয়েছি রাণি !”

“এতো তোমার ভোলা মন !—তা হ’লে একটু অন্তরালে গেলেই এ দাসীকে—এ পদসেবাকাজিগী পরিচারিকাকে বোধ হয় ভুলে যাও !”

“তা নয় রাণি ! ষোল আনা মনটা তোমায় দিয়ে ফেলেছি ; স্ততরাং অল্প সব কাজেই ভুল হ’য়ে যায় ।”

রাণী শিরস্ত্রাণ অঙ্গত্রাণ প্রভৃতি উন্মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, “এখন স্থির হ’য়ে বসে বল দেখি, কি ক’রে কি হলো ?—কি ক’রে কি ঘটলো ?”

একখানি বহুমূল্য আসনে রাজা উপবেশন করিলেন । রাণী উৎকর্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

তদদর্শনে রাজা সহাস্যে বলিলেন, “রাণি ! এ বসা ভো আমার সম্পূর্ণ হলো না !”

“কেন ?”

“আমার অর্দ্ধাঙ্গ যে দাঁড়িয়ে !”

স্মিতমুখে বাম পার্শ্বে রাণী রাজার সন্নিবর্তিত আসনে উপবেশন করিলেন ।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিনীতভাবে রাণী বলিলেন, “একটা কথা—  
অগ্রাধ্য অধিকার হ'লেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি। যদি রাগ  
না কর, তবে বলি—”

“রাগ করবো তোমার উপর! যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব—  
বিশ্বসংসারে যে আমার একমাত্র মঙ্গলাকাজক্ষিণী, তার উপর  
রাগ করবো! ছিঃ রাণি, আমায় এতটা হীন মনে করো না!”

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া রাণী বলিলেন, “সেনাপতি বিক্রমসিংহ  
ও রণেজনারায়ণ নাকি নির্ধাসিত হয়েছে?”

“হঁ। সেই দুই সয়তানকে নির্ধাসিত করেছি।”

“আর বিক্রমের শূত্রপদে এক অপরিচিত রাঠোর-যুবককে  
না কি নিযুক্ত ক'রেছ! এ কি সত্য?”

“সম্পূর্ণ সত্য।”

কিঞ্চৎ ইতস্ততঃ করিয়া রাণী বলিলেন, “কেন মহারাজ,  
আমার সহোদরের বাহুতে কি শক্তি নেই? সে কি তোমার  
শুভকাজী নয়? সেনাপতির যোগ্যতা কি মহীপতির নেই?”

“শক্তি আছে কি না পরীক্ষা না করলেও—আমার বিশ্বাস,  
তার সেনাপতির যোগ্যতা আছে।”

“তবে মহীপতিকে সেনাপতিপদ প্রদান না করে, এক অজ্ঞাত-  
কুলশীল যুবককে সে পদে নিযুক্ত ক'রলে কেন?”

“রাণি, মহীপতিকে বিকানীর-সিংহাসনে বসাতে পারি, কিন্তু  
সেনাপতির পদ তাকে দিতে পারি না।”

“কেন?”

“সেনাপতির পদ রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হলেও সেনাপতি রাজ্যের অধীন—আজ্ঞাবাহী। মহীপতি অতি নিকট আত্মীয়; আত্মীয় আত্মীয়ের আজ্ঞাপালনে অপমান অনুভব করে, উভয়তঃ একটা সম্বোধন—শঙ্কা থাকে। আর মহীপতি ঘোড়া হলেও অতি চঞ্চলচিত্ত বালক, সেনাপতির দায়িত্ব বড় ভাষণ, সেনাপতি রাজ্যরক্ষাকারী, রাজ্যের সিংহাসনের স্তম্ভ। সে গুরুভার বহনে মহীপতি অপারগ।”

“আর সে যুবক যে পারবে,—কেমন ক’রে তা বুঝলে মহারাজ !”

“বুঝছি তার অদ্ভুত সাহসে, অমানুষিক বীরত্বে, অপূর্ণ কৌশলে। যখন শত সহস্র দস্যুর কোষোন্মুক্ত শাণিত তরবারির তলে দাঁড়িয়ে প্রতিপলে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলাম,—সেই সময়ে মাত্র দুই শত সৈন্য সহায়ে বীর যুবক আমায় দস্যুবল হ’তে উদ্ধার ক’রেছে! লোকে এ কথা বিশ্বাস করতে পারবে না;—মনে করবে—এ অসম্ভব! একটা আজগুবি গল্প মাত্র !”

“মানলুম—শৌর্য্যে, বীর্য্যে সে অতুলনীয়—অজেয়। কিন্তু সিংহাসনে তার লোলুপ দৃষ্টি থাকতে পারে !”

“রাণি! আজ যদি আমি দস্যুর হস্তে বন্দী অথবা নিহত হতুম, কিংবা দস্যু এসে যদি বিকানীর-সিংহাসন অধিকার করে বসতো, তা হ’লে আজ বিকানীরের কি অবস্থা হতো বল দেখি ?”

কণ্টকিত দেহে রাণী বলিলেন, “তা হ’লে বিকানীর অন্ধকার-

সমুদ্রে ডুবে যেত, আর ভীষণ জলকল্লোলের মত একটা ভয়ঙ্কর হাহাকার-ধ্বনিতে বিকানীরের আকাশ ধ্বনিত হ'য়ে উঠতো ! - লক্ষ লক্ষ লোকের তপ্ত নিঃশ্বাসে বিকানীরের বায়ু উষ্ণ হ'য়ে— চঞ্চল হ'য়ে উঠতো !”

“তবে বল দেখি—সেই অন্ধকার-সমুদ্র হ'তে অঘাচিতভাবে যে যুবক বিকানীরকে উত্তোলন ক'রে তার ললাটে গৌরব-টীকা অঙ্কিত করেছে—অধরে শান্তির হাস্য ফুটিয়েছে, সেই যুবক ঈশ্বরী সিংহই যদি আবার তা কেড়ে নেয়, নিক্ : তাতে আমার দুঃখ নেই—ক্ষোভ নেই !—

—ঈশ্বর-ই দান করেন, আবার ঈশ্বর-ই হরণ করেন। ঈশ্বরী-সিংহ দিয়েছে, যদি ঈশ্বরীসিংহই আবার নেয়, নিক্ ; তথাপি প্রাণ-দাতা—মানদাতাকে অবিশ্বাস করতে পারবো না। রাণি, আমি বিকানীরের রাজা ; অতটা হীনতা এখনও আমাতে আশ্রয় গ্রহণ করেনি !—করবার পূর্বে যেন মৃত্যু এসে কঠোর কুলিশ-প্রহারে আমার হৃদয়কে চূর্ণ করে দেয় !”

সজ্জননয়নে আসন ত্যাগপূর্বক রাণী বলিলেন, “মহারাজ, আমি তোমার অযোগ্যা, তোমার উচ্চ প্রাণকে—মহৎ উদার হৃদয়কে অবনমিত করতে—কলঙ্কিত করতে গিয়েছিলুম ! অপ-রাধিনী আমি,—”

“তবে অপরাধিনী—উপস্থিত তুমি আমার বন্দিনী !”

সতাই রাণী অচিরে বন্দী হইলেন।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বহুবিধ মনোরম পুষ্পময়, চলন্ত চিত্রময়, সৌন্দর্য্যে ভরপুর, হৃদয় আকুল করা মনোহর এক উদ্যান ।

উদ্যান পুষ্পময়, রূপময়, হাস্য-লাস্যময় ।

উদ্যানের বৃক্ষে বৃক্ষে থরে থরে পুষ্প ; এখানে পুষ্প, ওখানে পুষ্প, সেখানে পুষ্প, বৃক্ষে পুষ্প, মর্ম্মর-বেদিকায় পুষ্প, তৃণোপরি পুষ্প, পুষ্পে পুষ্পে পুষ্পময়, কুঞ্জে গুঞ্জে লতায়-পাতায় অপরূপ শোভাময় । যেন পুষ্পের দ্বীপ—বিশ্বপুষ্পের ভাণ্ডার, যেন পুষ্পরাজ্য, যেন নন্দনের পুষ্প ও মর্ত্ত্যের পুষ্প সেই উদ্যানে একত্র মিলিত হইয়া আনন্দোৎসবে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে ।

স্বরম্য মর্ম্মর-বেদিকায় ও মর্ম্মণ-কোমল তৃণদলোপরি সজীব-পুষ্প-কুমারীরা সজীব-রত—আর বৃক্ষস্থ পুষ্পবালারা আনন্দে অধীরা—বিহ্বলা—বিবশা হইয়া হেলিয়া ছলিয়া নাচিতেছিল—মাথা দোলাইয়া তাল দিতেছিল । মধুময় সে কম-কণ্ঠধ্বনি, প্রেমোন্ময় ছন্দোন্ময় সে সপ্তস্বর সজীব—সবাই অধীরা ! অধীরা—সৌন্দর্য্যে, অধীরা—ঘোবন-গর্বে, অধীরা—মনমজান স্থলিত নৃত্যহনে । তাহাদের মুখে চোকে হাসি ;—বৃক্ষের পুষ্পেরও মুখে চোখে হাসি । সবাই সুন্দরী, সবাই কিশোরী । মলয়—সজীব-চিত্রের স্বর-লহরী, আর বৃক্ষস্থিত পুষ্প-বালাদের সৌরভরাশি কাঁধে লইয়া মিগুস্তে ছুটিতেছিল । সৌরভে, সৌন্দর্য্যে, সজীব-উন্নত—

মাতামাতি—কোলাকুলি চলিতেছিল। বড় সুন্দর সে দৃশ্য! সে দৃশ্য প্রেমিকার অন্তর্ভূতির—প্রেমিকের স্বপ্ন—রসিকের কল্পনা—বৃদ্ধের অতীত জীবন-স্মৃতি—জ্ঞানীর কিছু না।

সৌন্দর্যের-যৌবনময়ী ষোড়শী-প্রেমিকার প্রেম-সঙ্গীতে উজ্জ্বল মুখরিত। যেন শত ভ্রমরের গুঞ্জন—কোকিলের ঝঙ্কার—পাপিয়ার তান একত্রে সংমিলিত; যেন সব মধুবাণ একত্রে ঝঙ্কত।

যদি সে সৌন্দর্য ও যৌবনের ঘাত-প্রতিঘাতের আলোক-ছটা কোন পুরুষ দেখিত বা শুনিত, তবে সে মরিত—জগতের সব ভুলিয়া সেই সজীব চিত্রময়ীদের চরণে নিজের চিত্ত বিকাইত।

সকলেই সঙ্গীতে বিভোরা—মাতোয়ারা।

সহসা পশ্চাৎ হইতে অমিয়কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—“থামিয়ে দে, থামিয়ে দে এ প্রেম সঙ্গীত—থামিয়ে দে। গাইবি যদি গান,—তবে এমন গান গা, যার তানে নেচে উঠবে প্রাণ! গা—চারনীদের গান,—নিজ্জীব প্রাণও মেতে ওঠে যে গানে।”

সকলে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, বিকানীর রাজনন্দিনী দণ্ডায়মানা। অধরে তাঁর সরস হাস্য, নয়নে তাঁর চকল বিজলী-প্রভা, বদনে কম-শোভা, ওষ্ঠে তাঁর ললিত-লাশুলীলা, অঙ্গে তরঙ্গায়িত যৌবন-সৌন্দর্যের প্রবল প্রাবল—মদনের মধুময় খেলা।

সঙ্গীত থামিল। যেন একটা সুর, একটা সঙ্গীত রেষ থামিল—একটা স্বপ্ন টুটিল।

রাজনন্দিনী ইন্দুজা, বিকানীরের স্বর্গগতা প্রধানা রাজ্ঞীর গর্ভজাতা। শৈশবে মাতৃহীন হইলেও বিমাতা রাণী প্রতিভা-ময়ীর যত্নে ও স্নেহে তিনি মাতার অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই।

রাজবালা অপূর্ব সুন্দরী, কিশোরী, অনুঢ়া। তাঁহার সে রূপের তুলনা নাই, যেন মৃষ্টিমতী অপ্সরা—যেন সজীব প্রকৃতি-প্রতিমা।

নৃপনন্দিনী অপূর্ব বেশে শোভিতা, নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা। মস্তক মণিময় স্বর্ণস্থত্রে বেষ্টিত, কর্ণে হীরক-হুল—যেন চাঁদের পাশে দুটা ফুল। কণ্ঠে মতির মালা—চাঁদের কোলে যেন অতুজ্জল তারাহার। বাহুতে রত্নময় বলয়—যেন চন্দ্রবেষ্টিত রামধনুর গ্রায় শোভা পাইতেছিল, মণিমুক্তাদি-খচিত বহুমূল্য গাত্রাবরণখানি তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রে পড়িয়া রাজকুমারীর স্বকুমার অঙ্গে উঠিবার জন্ত আকুল আগ্রহে লুটাইতেছিল।

রাজনন্দিনীর প্রধানা সহচরী চতুরা চপলা নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, “রাজকুমারি! তুমি কি গান ভালবাস না?”

“না, চারুগীদের গান ছাড়া অন্য গান আমার ভাল লাগে না।”

“কেন?”

“অন্য গানগুলার অধিকাংশই দুর্বলচিত্ত যুবকযুবতীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে। শুধু কবির অলীক কল্পনা, শুধু আড়ম্বরপূর্ণ ভাষার ঝঙ্কার! চারুগীদের সঙ্গীতে মিথ্যার স্থান নেই, ত্রিভুবন-নিংড়ানো



ভাষার আড়ম্বর নেই,—অথচ প্রাণোন্মাদকারী। গা তোর।  
সেই সত্যময় সজীবতাময় উন্মাদনাময় মধুস্পর্শী চারুীদের  
গান গা।”

আবার বিহগিনীর মধুপ-কণ্ঠে উদ্ভান ভরিয়া উঠিল, স্তরে  
স্তরে নাচিয়া-নাচিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া স্বধার বন্ধারে বন্ধত  
হইল। আবার স্বস্বরে স্বতালে, স্ব-মধুময় সঙ্গীতে পুষ্পবালায়-  
পুষ্পবালায় ঢলিয়া-ঢলিয়া টলিয়া-টলিয়া মুহু হাসি হাসিয়া  
পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে পড়িল; অপূর্ণ সে সঙ্গীত। অতি  
সুন্দর সে সপ্নোখিতা, স্বপ্তস্বরাসম কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃ সঙ্গীত।  
ভাষায় অগ্নিশুলিঙ্গ, ছন্দে উন্মাদনা, ভাবে ভক্তি-বিজড়িত।

রাজকন্যা সব-ভোলাপ্রাণে সে সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

সঙ্গীত থামিল। যেন ত্রিহুবনের ত্রি-তার-গ্রথিত বীণাবাণ  
নীরব হইল। বিহ্বল, বিভোর, বিমুগ্ধ রাজকন্যা—মুগ্ধ উদাস  
কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “আহা কি সুন্দর, কি অমৃতময় এ  
সঙ্গীত! এর প্রতি মুহূর্ত্তনায় জাতীয় জীবনের উদ্বোধন, প্রতি  
বাক্যে অতীতের একটা গৌরবস্মৃতি, প্রতি ছন্দে দেশপ্ৰীতি—  
মাতৃভক্তি! এ সঙ্গীতের চেয়ে সুন্দর আর কি কোন সঙ্গীত  
আছে নীলিমা?”

“তোমার কাছে নেই বটে,—কিন্তু আছে।”

“কি সে সঙ্গীত?”

“সে সঙ্গীত প্রেমময়—মধুময়! তার ছন্দে-ছন্দে পুলক, উৎখানে-  
পতনে প্রেম, ভাবে-ভাষায় ভালবাসা।”

“চুলোয় যাক—ডুবে যাক—রসাতল-গর্ভে লীন হোক সে সঙ্গীত। ভালবাসা প্রেম, রমণীর হৃদয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সে কি শুধু পুরুষকে দেবার জন্য ?”

“তবে কাকে দেবার জন্য রাজবালা ?”

“ভগবানকে দেবার জন্য—আর তা যদি না দেয়, তবে—জগতে স্বরধুনীর মত সে প্রেম ছুটিয়ে দিক। জগৎ সে প্রেমধারায় স্নাত হয়ে ধন্য হোক—শীতল হোক—পবিত্র হোক। তা না ক’রে—যে নারী আপনাকে হারিয়ে, রমণীর উপাসক—ললনার স্তুতিকারক পুরুষের পদে সেই নির্মল অগাধ জলধিসম প্রেম ঢেলে দেয়, তাকে আমি ঘৃণা করি।”

“পুরুষমাত্রেই কি রমণীর উপাসক, না ললনার স্তুতিকারক ? না রাজনন্দিনি, তা নয়। তুমি যেমন পুরুষের উপর বিরক্ত—তুমি যেমন পুরুষকে ঘৃণা কর, তেমনি অনেক পুরুষ আছে—তারা রমণীর দিকে চায় না, রমণীকে তারা বিবজ্ঞান ক’রে দূরে থাকে।”

“হাঁ। পুরুষ এই রকমই হওয়া চাই। কর্তব্য ও নিবেদন দান ক’রে—ধর্মের মুকুট শিরে তুলে—কীর্তির কনক-হারে যে কণ্ঠ শোভিত করতে পারে, সেই পুরুষ—যার রমণীর অনারক্ষণস্থায়ী রূপমোহে লিপ্ত হয়ে, যে নিজের দেহকে—আত্মাকে রূপের চরণে বলি দেয়, সে শুধু পণ্ড নয়—মহাপণী। যার কর্ম নাই, কীর্তি নাই, সে পুরুষ নয়, মাহুষ নয়, জড়পিণ্ড। রমণীর ক্রীড়নক—সজীব-পুতুল।”

“তা বটে, কিন্তু বীৰ্য্যবান, কীৰ্ত্তিবান, গুণবান পুরুষ কি রাজস্থানে নেই রাজনন্দিনি ?”

“না নেই,—তবে হাঁ, একজন ছিলেন বটে ।”

“কে তিনি ।”

“কে তিনি ? তিনি অপ্রতিহত প্রতাপশালী পুরুষসিংহ রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর পৃথ্বীরাজ । নীলিমা ! নীলিমা ! এমন বীর,—এমন অমিততেজা যোদ্ধা—এমন সমুদ্রপ্রতিহতপ্রতাপ—এমন শমনের সাহস আর কখনও শুনেছিম্ কি ? বাঙ্গা-রাওয়ের পর—এমন বীর রাজস্থান আর কখন বক্ষে ধারণ ক’রেছে কি ? ওঃ কি অমাতুল্যিক শক্তি ! একদিকে সহস্র রাজপুত্র রাজ-রাজন্যবর্গ, অন্যদিকে তিনি একা । এক হস্তে তাঁর রমণী, অন্য হস্তে কুপাণ । শক্তি ও পুরুষের এমন প্রকৃত মিলন—এমন অমরার অপার্থিব সংঘটন বুঝি এ যুগে আর কখনও ঘটে নি ! যেন দ্বাপরের স্বভদ্রা-হরণের মত—পার্থের অপার্থিব লীলা-চক্র প্রদর্শনের মত কলিতে একবার প্রতিফলিত হয়েই চকিতে মিলিয়ে গেল ।”

“সত্য বটে, পৃথ্বীরাজ এ পৃথিবীতে বীরত্বে ও শৌর্য্যে অতুলনীয় ছিলেন । কিন্তু রাজস্থান কি এখন একেবারেই বীর পুরুষ-হীন ?”

“শত বারের পর যদি আরও একবার বলতে হয়, তবুও ব’লব, বর্তমান রাজস্থানে প্রকৃত যোদ্ধা, প্রকৃত বীরপুরুষ এখন আর কেউ নেই ! হাঁ, সত্যই কেউ নেই ।”

“সমগ্র রাজস্থানব্যাপী শত সহস্র রাজগৃহ—শত সহস্র রাজ-  
নন্দন ধারা র’য়েছেন, তাঁরা তবে কি ?”

“তাঁরা সব কঙ্কাল ! তাঁদের চিন্তা—প্রেম, তাঁদের আকাঙ্ক্ষা  
—রমণী । রমণী-হৃদয়-রাজ্য জয় ক’রতে তাঁরা সদাই ব্যাকুল—  
সদাই চেষ্টিত । সুশাসিত অস্ত্র দেখলে তাঁদের হৃদয়ে শঙ্কা আসে—  
তাই তাঁরা অস্ত্র ফেলে যুক্ত করে রমণীর স্তুতিগানে তন্ময় হয়ে  
থাকেন কোথায় কোন রাজ্যোত্থানে নব প্রসুতি  
সেই সন্ধান রাখতেই তাঁদের সময়টিবাহিত হয় । যেমন  
শুনলেন, কাশ্মীরের রাজ্যোত্থানে সংযুক্তা-পুষ্প প্রসুতি হ’য়েছে,  
অমনি লোলুপ হৃদয়ে সবাই ছুটলেন—সেই কাশ্মীরে । কিন্তু  
যখন ভারত-গৌরব-রবি পৃথ্বীরাজ এসে সে পুষ্পটি নিয়ে চ’লে  
গেলেন, তখন প্রেমিক-বীরেন্দ্রবন্দ শুধু হাঁ করে চেয়ে রইলেন,  
—অস্ত্রকোষ হতে অসিনিষ্ক্রামনের বা একটু বাধা প্রদানের  
শক্তি, সাহস, বা সামর্থ্য কারুর হ’ল না ; —এমনি বীরের  
বীর সেই রাজগৃহবর্গ ও রাজকুমারেরা । তারপর আবার  
যখন শুনলেন, বিকানীর রাজ্যোত্থানে ইন্দ্রজা-পুষ্প ফুটেছে,  
অমনি শত হস্ত প্রসারিত হ’ল । তাদের সেই অস্ত্রধারণে  
অক্ষম, দুর্বল, ক্ষীণ কম্পিত হস্তে স্বেচ্ছায় বন্দিদা হওয়া অপেক্ষা  
মরণও আনন্দের । একটা দৃশ্য,—প্রমত্ত দানবের মত যথেষ্টাচারে  
রাজস্থানের বক্ষের উপর তাণ্ডব নৃত্য ক’রছে, রাজ চক্রবর্তীর  
হায়ে নিজের শক্তিতে সারা রাজস্থান শাসন ক’রছে, চোক  
রাঙাছে—তার সে জুকুটা-কুটিল রক্তিম চক্ষু দু’টো উপড়ে

ফেলতে কারও হস্ত প্রসারিত হ'ল না—তার শক্তিকে প্রতিহত  
করবার সাহস বা ইচ্ছা কারও মনে একবার জাগল না !

তারপর এই সেদিনের কথা;—একটা মুসলমান এসে সমগ্র  
রাজস্থানের মস্তকে সগর্ভ পদাঘাত করে, রাজবারার পুণ্য-মন্দির  
সোমনাথ চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধ্বংস করে চলে গেল, অথচ কেউ তার  
গতিরোধ করতে পারলে না, আশ্চর্য্য বটে ! তাই বলি নীলিমা,  
রাজস্থান এখন বীরশূন্য, জড়ের মত অকর্মণ্য, বিলাসীতার  
ঘূমে অচেতন, স্বপ্নে বিভোর, রমণীর মোহে আচ্ছন্ন। হাসি  
পায় ! এই সব রমণী বসনাঞ্চলধারী পুরুষের চরণে নিজেকে বিজয়ী  
ক'রবে ? না—না, তা কখনো পারবে না। শোন্ সব, আজ  
এক নূতন খেলা খেলবো। মালীকে মাটি আনতে বল ।”

“মাটি ? মাটি কি হবে !”

“মাটিতে মূর্তি তৈরী হবে। তোরা সবাই একটা করে  
মাটির নারী মূর্তি তৈরী করবি, আর প্রতি মূর্তির চরণে নতজাহ্ন  
যুক্তকর, একটা করে পুরুষ মূর্তি তৈরী করবি। যার নিখুঁত তৈরী  
হবে, তার পুরস্কার এই কণ্ঠহার ।”

“এ কি অদ্ভুত খেলা, রাজকন্না !”

“এ অদ্ভুত নয়, প্রত্যক্ষ । এ খেলা নয়, পুরুষের স্বভাবের স্বরূপ  
ছবি ।”

“বলছ বটে, কিন্তু তোমার এ গর্ভ থাকবে না রাজকুমারী ।”

“আমার গর্ভ অটুট—কখনই ভাঙবে না ।”

“আমি আবার বলছি, —তোমার এ গর্ভ কণ্ঠভঙ্গুর ।”

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

## নবম পরিচ্ছেদ ।

আহা-হা ! কি কনকোজ্জল রক্তিমাময় এই প্রভাত !  
অতি সুন্দর স্বচ্ছ শাস্ত—অতীব মধুর ।

বিশ্বের উপর অমৃত-নিষ্কার বহিয়ে, প্রকৃতিকে কনকভূষায়  
বিভূষিত করে তার অবগুষ্ঠণ উন্মোচনে, অপূর্ব স্বর্ণ বেশে  
সজ্জিত হ'য়ে, একি মোহনমুর্তিতে উদয় হয়েছ দিনকর ? আহা,  
তুমি এত সুন্দর ! এত সুধমা তোমার ! তোমার ঐ অরুণ  
অলক্ত মুক্তি দেখে সহস্রলোচন হবার বর প্রার্থনা ক'রতে সাধ হয় ;  
ক্ষণভঙ্গুর জীবনে অমরত্ব লাভ করবার বাসনা জেগে ওঠে ।  
কিন্তু তাতো হবে না দেবতা ! এ মরজগতে থেকে ত সে আশা  
পূর্ণ-হবার নয় ; আমায় ঐ দেশেই যেতে হবে । তবে দাঁড়াও  
অংশুমালি, তোমার ঐ সহস্রাংগ জাল ফেলে আর কিছুক্ষণ  
অপেক্ষা কর, আমি মরজগতের মায়াজাল ছিন্ন করি, তারপর  
আস্তে আস্তে তোমার জাল গুটিয়ে নিও । একটু দাঁড়াও—ভরা  
চ'কে একবার শেষ দেখা দেখে নি !”

শিশির-সিক্ত কমলবৎ সজল নয়নে সেনাপতি বিক্রমসিংহ  
তরুণ অরুণের প্রতি চাহিলেন ।

সেনাপতি নদী-তীরে এক উপলথণ্ডে উপবিষ্ট । মস্তকে  
উষ্ণীয় বা শিরস্ত্রান নাই; কোষে অসি নাই, কর্ণে কুণ্ডল বা  
কিছু নাই । সেনাপতির কেশ ইতস্ততঃ বিক্শিপ্ত, নয়ন কালিমা-  
চ্ছন্ন, বদন বিবাদময় ।

সেনাপতি সারা নিশা বিনীত হইয়া শুধু চন্দ্রমার শোভা দেখিয়াছেন, এখন নবাক্ষরের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি নয়ন ফিরাইলেন, দেখিলেন, দূর আকাশের গায়ে ধূসর-ধুমায়িত তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা।

শস্ত্রক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, যেন নীল আকাশের কোলে তাহার নয়ন মগ্নকর শ্রামকান্তি মিশিয়া এক বর্ণ-বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। আর বাতাস তাহাদের উপর দিয়া ঢেউ খেলিয়া বহিয়া যাইতেছে।

প্রকৃতির নগ্ন-সৌন্দর্য্য দর্শনে সেনাপতির মনে হইল, যেন তাহারা তাহাদের মাথাগুলা নত করিয়া কোন এক অনন্ত শক্তির উদ্দেশে বলিতেছে, ওগো, ওগো আমাদের বরণীয়া—ওগো আমাদের পূজণীয়া! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধন্য কর—আমাদের শস্ত্রজীবন সফল কর! সেনাপতি বিমুগ্ধ হইলেন। দেখিলেন, যেন আজ প্রকৃতি-সুন্দরী সবুজ রংয়ের ওড়নাখানি ধরাতলে বিস্তৃত করিয়া দিয়া আনন্দসাগরে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছে! বৃক্ষের শাখায় শাখায়, কাননের লতায়-পাতায় কুসুমরাজি স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত—তাহাদের অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় ইন্দ্রধনুও লাক্ষিত—পরাজিত। দলে দলে নৃত্য-অধীরা মধুপগণ মধুগন্ধে উন্মাদিনী হইয়া পুষ্পে পুষ্পে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধু পান করিয়া বেড়াইতেছে, আবার ক্রান্ত হৃদয়ে ফুলের চুষন পানে ফুলের শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িতেছে—আহা, কি সুন্দর!

“মা, বিকানীর জননী আমার! ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য-হারিণী—

অনন্ত অক্ষরন্ত শোভাশালিনী,—রূপ-রস-গন্ধময় শান্তোজ্জ্বল,  
করুণাময়ী মা আমার ! তোকে ছেড়ে, তোর এ পবিত্র পুণ্য  
কোড় হতে কোথায় কোন অজানা দেশে যাব মা ? কি পাপ  
করেছিল এ দীন সন্তান তোর ও রাঙাচরণে, যার গুরুদণ্ডে  
জননী হ'য়ে বিতাড়িত কচ্ছিলাম ! না মা, আমায় বিতাড়িত  
করিসনে মা ! আমি যে তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবোনা  
মা ! তুই যে আমার সব । আমার সাধনা—আমার ধ্যানময়ী দেবী  
তুই—তোর কোল ছেড়ে কোথাও যাব না মা । তুই যে মা আমার  
ত্রিদিবেশ্বরী—তুই যে আমার স্বর্ণ মোক্ষ—আমার আরাধনার  
দেবী । মরতে হয়, তোরই ঐ সর্ব-সৌন্দর্য্যময়ী ভুবন-হারিণী  
“ভুবন-মোহিনী ভুবন-ভুলান রূপ দেখতে দেখতে, ঐ অমল  
কমল রক্ত-চরণ ধ্যান কবতে করতে তোরই চরণ তলে মাথা  
রেখে মরব মা !”

কনক-বসন পরিহিতা বর্ষাবারি—প্রাবিতা তরঙ্গিণি ! কোন্  
অপরোধে, আমার সারা জীবনের সাধনা বাসনা, আমার কামনা  
প্রার্থনা সব ডুবিয়ে দিলি অতল-সলিলে ? তোর হৃদয়াপেক্ষা  
গভীরতর কলঙ্কের মধ্যে কেন নিক্ষেপ করি গভীর ! একবার—  
একবার মাত্র মূর্ত্তিময়ী হয়ে, উচ্চকণ্ঠে বিকানীরকে বল, এ তোরই  
ছলনা, এ তোরই রচনা ! একবার বল—অন্ততঃ একবার  
ভাষাময়ী হ'য়ে আমার রাজাকে বল—আমি বিশ্বাসঘাতক নই ;  
একবার এক মূহুর্তের জন্য এ অন্ধকার রহস্তের যবনিকা  
উন্মোলনে জগৎকে দেখিয়ে দে—জানিয়ে দে বারি-বাহিনী—



সেনাপতি বিক্রমসিংহ বিশ্বাসঘাতক নয়—সে রাজভক্ত, মাতৃভক্ত  
বিকানীর জননীর স্তন্যপায়ী সন্তান। দে দে, একবার জানিয়ে  
দে উর্ধ্ব-মালিনি !

শুনলিনি, শুনলিনি ! তবুও তোর দয়া হলো না জলময়ি !  
এত ক্রোধ—এত তোর আমার উপর আক্রোশ ! তুই-ই আমার  
প্রাণে মৃত্যু ইচ্ছা জাগিয়েছিস—আমায় বিশ্বের চক্ষে নিন্দিত—  
ঘৃণিত করেছিস ! আমার প্রাণটুকু না নিলে বুঝি তোর  
তৃপ্তি হবে না, তরল-তরঙ্গ ! তবে তাই নে, বিনিময়ে—যদি  
দয়া হয়, বলিস, তোর জল-কল্লোলে চরাচর প্রকম্পিত করে  
বলিস, ‘সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক নয় ।’ জগৎ জাহ্নুক, সেনাপতি  
বিক্রমসিংহ পশু নয়—মাৎস্য, বিশ্বাসহস্তানয়—মাতৃভক্ত, রাজাহ্নুরক্ত  
বিকানীর জননীর সেবক ।”

সেনাপতি প্রবাহিনী বক্ষে বাষ্প প্রদানে উত্তত হইলেন ।

সহসা সশস্ত্র একব্যক্তি অতিদ্রুত বৃক্ষান্তরাল হইতে নির্গত  
হইয়া মরণোন্মুখ সেনাপতির দক্ষিণ কর দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণে, বজ্র  
কণ্ঠে বলিলেন, “জগৎ তা জেনেছে সেনাপতি ।”

চমকিত চিত্তে সেনাপতি পশ্চাতে চাহিলেন, তারপর  
বিস্ময়াগ্নুত কণ্ঠে বলিলেন, “একি, নবীন সেনাপতি ঈশ্বরীসিংহ !  
তুমি ! তুমি কেন এসে সর্বভূখহারিণী মৃত্যুর জোড়ে আশ্রয়  
গ্রহণে আমার বাধা দিলে ?”

“ভেবেছ কি বিক্রমসিংহ, চক্ষের সম্মুখে মর্তের এক অনৈ-  
শ্বর্যগীক ছবি, সজীব দেবমূর্তিকে এ বারিবক্ষে ডুবে যেতে দোবো !

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

কখনও তা দোষো না সেনাপতি। তুমি যে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান—মানবের শিরোভূষণ।”

“মরণ প্রয়াসীকে প্লেবে বিক্রপে জর্জরিত করা, বীরের কার্য নয় নবীন সেনাপতি।”

“প্লেব? না সেনাপতি, এতে প্লেবের ইঙ্গিত নাই, বিক্রপের রেখাপাতও নাই, এ সম্পূর্ণ সরল সত্য। এ আমার অন্তরের অনাবিল কথা।”

“তথাপিও এ রঞ্জিত—বৃথা সজ্জিত। বিশ্বাসঘাতকের স্থান উদ্ধে নয়, নরকের নিম্নে,—চিরান্ধকারে। বিশ্বাসঘাতকের তুলনা, উপমা, মানব অভিধানের বহির্ভূত। হাত ছাড় যুবক—বিশ্বাসঘাতকের মরণই শ্রেয়।”

“কে বিশ্বাসঘাতক, তুমি! ঐ সরল স্নন্দর শান্ত স্বচ্ছ অমল-কমল-বদন, ঐ করুণা স্ফূরিত দীপ্তিমান পুণ্যালোক প্রতিফলিত নয়ন, ঐ দেব-লাঙ্ঘিত অল্পম, অতুলন, জ্যোতির্ময় দেহকান্তি, ওকি সয়তান—পিশাচের আবাসভূমি হ’তে পারে! তা হ’লে যে সৃষ্টি বৃথা—নাম মিথ্যা হবে।”

“নব সেনাপতি, আমার উপর অর্পিত এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও অপণোদিত হবে না—হওয়া অসম্ভব। আমার শত শপথ—সহস্র বাক্য বৃথা হবে। জলময়ী—ভাষাময়ী মূর্ত্তিময়ী হয়ে এ অন্ধকার-ঘবনিকা অপসারিত না করলে, সত্যের আলোকমূর্ত্তি বিভাষিত হবে না। তাই বলি, বৃথা যুক্তিতর্কে, মিথ্যা বাক্যে অযথা বিলম্বের প্রয়োজন নেই, হাত ছাড়, ঈশ্বরীসিংহ।”

“হিঃ বীর, হিঃ সৈনিক, তোমাতে এ নিবুদ্ধিতা শোভা পায় না।”

“এ নিবুদ্ধিতা নয়, কলঙ্কমোচন।”

“কলঙ্কের কবল হতে উদ্ধারের জন্য আত্মহত্যা;—এ নিবুদ্ধিতা নয় ত কি সেনাপতি? কলঙ্কহীন মাহুষ বা দেবতা কেহই নেই। তাই বলি, বৃথা প্রাণ বিসর্জনে কোনও লাভ নেই, আর জীবনের বিনিময়েও ত এ কলঙ্ক মোচন হবে না বীর।”

“তবে কি বিশ্বের অনাদৃত—মানবের ঘৃণিত হয়ে এ কলঙ্কের স্তম্ভ মাথায় বহন করে, বিকানীর-জননীর স্নেহচ্যুত হয়ে, দেশে দেশে আত্মগোপনে এই কায়টাকে—এই দেহটাকে পণ্ডর ত্রায় বহন করতে উপদেশ দাও? কিন্তু উপদেষ্টা! তোমার এই উপদেশ গ্রহণে আমি অক্ষম। যাও, গৃহে ফিরে যাও যুবক।”

“অনর্থক জীবননাশ মাহুষের ধর্ম নয়, সেনাপতি।”

“মাহুষ! এখনতো আর মাহুষ নই, এখন আমি বিশ্বাস-ঘাতক সম্মতান! ছিলাম। একদিন মাহুষ ছিলাম। যখন আমার নাম বিকানীর গর্ভভরে আনন্দে উচ্চারণ করত, যখন আমার ঈর্ষিতে এককালীন লক্ষ শাণিত রূপাণ শুল্লে উথিত হ’ত, যখন সভক্তি অন্তরে আমার নামে সৈন্তেরা জ্বল, স্থল, ব্যোম প্রকম্পিত করত, সেই তখন—তখন আমি মাহুষ ছিলাম। এখন আমি শুধু যুগের আধার, কু-আদর্শ, মানবের বিপদের মত পরিত্যাজ্য, তাই আজ তুমি আমার উপদেষ্টা। কিন্তু ভাব দেখি একবার যুবক,

আজ যদি তোমার শুভ্র যশোলিঙ্গ শিরে—মিথ্যা, অনপণেয়  
এইরূপ কলঙ্ক অর্পিত হ'ত, এই রকম করে—যে জননী জন্মভূমির  
ক্রোড়ে হেসেছ, খেলেছ, কেঁদেছ—বার শ্যাম-চ্ছায়ায় থেকে  
পরিবর্দ্ধিত পরিপুষ্ট হয়েছ, সেই সর্ব সৌন্দর্যের রাণী, স্বর্ষমার  
খনি দেবীস্বরূপিনী জন্মভূমির স্নেহচ্ছায়া হ'তে, সংসারের প্রীতি  
ভোর হতে জোর করে টেনে হিঁচড়ে তোমায় যদি দূর করে  
দিত—সহস্র ঘণার দৃষ্টি যদি তোমায় সতত দৃষ্টি করত—যদি তুমি  
তোমার দেশের, তোমার রাজ্যের স্নেহ কঙ্কণ বিশ্বাস হতে  
বিচ্ছিন্ন হতে, তবে—তবে বল যুবক, তুমি কি করতে!—বল  
রাজপুত্র, এর চেয়েও দুঃখ—এর চেয়েও মহাশাস্তি—বল বীর,  
রাজপুত্রের অভিধানে এর চেয়েও অপরাধ আছে কি? ও হো-  
হো! এ যে অপরাধ নয়, এ মহানিরয়—মহা যাতনা।

নবীন সেনাপতি! কি করে—কি ভাষায় কেমন করে বোঝাব,  
কি এক মহা প্রলয়গ্নি ধূ ধূ করে করে অন্তরে জ্বলছে! বড় জ্বালা!  
বড় জ্বালা! জ্বলে গেল!—সমস্ত দেহ, হৃদয়, শিরা উপশিরা জ্বলে  
গেল। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ঐ শান্ত শীতল সলিলে এ জ্বালা  
জুড়াই! একি! একি! তোমার চোকে জল কেন? তুমি কাঁদ  
কেন? তোমার নয়নে এ অশ্রু কেন?”

“এ সহানুভূতির অশ্রু।”

“মিথ্যা কথা, এ সহানুভূতির অশ্রু নয়, সহানুভূতির অশ্রু  
বিমল, শান্ত, স্নিগ্ধ। কিন্তু তোমার এ অশ্রুতে স্নিগ্ধতা  
নেই, আছে—উত্তপ্ততা, আছে—অগ্নির প্রদাহ। নয়নে বদনে

তোমার সহায়ত্বের প্রতিচ্ছবি নেই। নাসারক, কম্পিত, চক্ষু অগ্নি-শিখা প্রজ্জ্বলিত, মুখমণ্ডল, ভীষণ তীব্র তীক্ষ্ণ প্রদীপ্ত হতাশন সম রক্তিম। বল বল, সত্য বল, কে তুমি ছদ্মবেশী যুবক !”

“আমি তোমারই গ্রায় ভাগ্যহারা, বিশ্বাস হারা।”

“তা বুঝেছি। কিন্তু তোমার পরিচয় কি ?”

ঈশ্বরী সিংহ নয়ন নত করিলেন। তদৃষ্টে বিক্রম সিংহ বলিলেন, “নত নয়ন, নিরুত্তর, তবে কি তুমি পরিচয় হীন !”

ঘৃতস্পর্শিত অগ্নির গ্রায় জলিয়া উঠিয়া নত নয়ন উন্নত করিয়া ঈশ্বরী সিংহ রোষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, “সাবধান বিক্রম সিংহ। বাক্য প্রত্যাহার কর, নতুবা—”

ঈশ্বরীসিংহের পিধান নির্মুক্ত অসি নবাকর্ণের রক্তিমালোকে হাসিয়া উঠিল। বিক্রমসিংহ অবিচলিত হৃদয়ে অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “নতুবা নিরস্ত্র আমি, আমায় হত্যা করবে—বাঃ, সুন্দর ! পরিচয়হীনের উপযুক্ত কার্য।”

দূরে অসি নিক্ষেপে অশ্রুজলকণ্ঠে ঈশ্বরী সিংহ বলিলেন, “অপরাধ হয়েছে ভাই ! অমার্জ্জনীয় হলেও—বিকৃত-মস্তিষ্ক জ্ঞানে মার্জনা কর সেনাপতি ! জেন, আমি রাজপুত। তোমারই মত স্বদেশ সেবক। বলবো, আমার দুঃখের কাহিনী, আমার নিরুদ্ধ হৃদয়দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত করবো। কিন্তু তোমার রাজার নামে, জগৎভূমির নামে শপথ কর, কখনও পরিচয় আমার প্রকাশ করবে না ?”

“শপথ করলুম যুবক।”

“তবে শোনো সেনাপতি। আমি স্বর্গীয় কাণ্ডকুজেশ্বর জয়চাঁদের কনিষ্ঠ পৌত্র শিবাজী।”

“সেকি, তুমি জয়চাঁদের পৌত্র!”

“পরিচয়ে মৃত্যু ইচ্ছা জাগে, কিন্তু আমার মৃত্যুতে তো বংশ-কালিমা যাবে না, তাই আমি মরতে চাই না। আমি পিতামহের কলঙ্ক বিদূরিত করতে চাই, নব হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এস, ভাই সম ব্যথার ব্যথী, সমহুঃখের হুঃখী, সমপথের পথিক! হুঁজুনায় সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে এ কলঙ্ককালিমা বিধোত করি! যে দস্যুর জন্ত তুমি ও কলঙ্কভার বহন কচ্ছ, সেই দস্যুর ঋধিরাক্ত ছিন্ন কবন্ধ রাজচরণে উপহার দানে, দস্যুর শোণিত-সাগরে বিশ্বাস ঘাতকতা ভাসিয়ে দাও, আর আমি পিতামহের নিমজ্জিত পাঠানকে ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত করে, ভারত-বর্ষেই পুনঃ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করে জগতকে দেখাই, জয়চাঁদ পৌত্র—জয়চাঁদ নয়। এস ত ভাই! সমতালে সমলক্ষ্যে সমপদক্ষেপে সমপথে দৃঢ়হৃদয়ে অগ্রসর হই; শত বাধা বিঘ্ন উন্নত বারণবৎ পদদলিত করে, মাতৃমস্ত্রে উদ্দীপিত হ’য়ে আলোকের পথে ছুঁটে যাই!”

“তাই চল বীর। নয় কলঙ্কমোচনে জীবন—আর নয় মরণ।”  
সংলিপ্ত করে উভয়েই অগ্রসর হইলেন। সহসা গভীর কণ্ঠে স্বনিত হইল, “দাঁড়াও!”

নিরঙ্ক গতিতে স্পন্দিত হৃদয়ে উভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপে

দেখিলেন, বিকানীর রাজ্যেশ্বর চন্দ্রনারায়ণ সোলাঙ্কি দণ্ডায়মান !  
উভয়েরই ঈষৎ আশা উৎফুল্লিত নয়নদ্বয় নিশ্চিন্ত নিষ্কম্প হইল।  
কয়েকপদ অগ্রসরে পূর্ববৎ ভাবে, পূর্ব অত্মরূপ কণ্ঠে রাজা  
বলিলেন, “দাঁড়াও, অমনি ভাবে অমনি করে দাঁড়াও, নোড়ো  
না। বিশ্ব এখনও সম্পূর্ণ জাগেনি, তাকে জাগিয়ে তুলতে  
হবে—এ চিত্র তাদের সম্মুখে ধরতে হবে, তাই বলি—দাঁড়াও।”

বিরস বদনে বিমলিন নয়নে বিম্বক কণ্ঠে ঈশ্বরীসিংহ বলিলেন,  
“রাজা! আমরা আপনারই অমুরক্ত, আজ্ঞাধীন। আমরা  
কোনও অসদভিপ্রায়ে যাচ্ছিলুম না, আমরা যাচ্ছিলুম—”

বাধা দানে রাজা বলিলেন, “চুপ-চুপ, কথা ক’য়োনা। কোনো  
কথা শুন্বনা, শোন্বার শক্তিও নেই। বাঃ, চমৎকার! চমৎকার  
শোভা—চমৎকার সংঘটন! স্বর্গ মর্ত এক হয়ে গেছে, ত্রি-দিবের  
শোভা মর্তে নেমে এসেছে, আমরা—বিশ্বের মুক্তিকায় লুপ্তিত  
হয়েছে। একাকার—একাকার সব একাকার—ত্রিভুবন আজ একা-  
কার হয়ে উঠেছে। পূণ্য-পুলক-স্পন্দনে সব নেচে উঠেছে—মেতে  
উঠেছে। বাঃ, কি স্তম্ভর! কি মহিমোজ্জ্বল চিত্র! এমনি  
করে দু’টিতে আমার দু’টি হাতের মত, দু’টি বক্ষের পঙ্করের মত,  
দু’টি নয়নের মত আমার সঙ্গে আমার অঙ্গে লিপ্ত হয়ে থাকো,  
আমায় শক্তিমান করে তোলো। বিক্রম, পুত্র, বৎস! যেমন  
তুমি বিকানীর শক্তির পরিচালক ছিলে, তেমনিভাবে বিকানীর  
শক্তিকে পরিচালনা কর—তেমনিভাবে সৈন্তদের প্রাণে নব  
প্রেরণা—নবশক্তিসঞ্চারে তাদের অহুপ্রাণিত কর।”

স্তম্ভিত বিশ্বয়ে সেনাপতি বলিলেন, “রাজা! ভৃত্যকে শাস্তি দিতে হয় দিন, কিন্তু গ্লেষে জর্জরিত করে তার হৃদয়কে দীর্ণ করে দেবেন না; তবে এটা স্থির জানবেন, আমি বিশ্বাস রক্ষক—ঘাতক নই।”

“কোনো কৈফিয়ৎ চাইনা, কোনো কৈফিয়তের প্রয়োজনও নেই। অতীত পৃথিবীর মত এ রহস্য—অন্ধকারের বুকেই থাকুক। সেই অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করে দেখতে চাইনা, তোমার চরিত্র কি ভাবে তাতে অঙ্কিত আছে। স্বকর্ণে যা শুনেছি, স্বচক্ষে যা দেখেছি, তাই যথেষ্ট—আর কিছু দেখবার শোন্বার আবশ্যক নেই। আর শিবাজী—আজ থেকে তুমি বিকানীর প্রধান অমাত্য। তোমরা দু’টিতে বিকানীরকে সজীবীকৃত কর, পুণ্য ও ধর্মালোকে উদ্ভাসিত করে দাও, আদর্শ চরিত্রে দেবতার ঈর্ষা জাগিয়ে তোলা। তোমাদের নামে পাপ নরক দূরে যাক, জ্বাঘ ও নির্ভা আনন্দে নেচে উঠুক, সপ্তস্বর্গ হতে তোমাদের মস্তকে আশীষ-ধারা বর্ষিত হোক। বাদ্যের বাজারে, সঙ্গীতের মুর্ছনায়, প্রণবধনীর মত তোমাদের নাম বেজে উঠুক।”



## দশম পরিচ্ছেদ ।

“এ কার মূর্তি চামেলীয়া ! ”

“সেনাপতি বিক্রম সিংহের । ”

“মূর্তিটি গড়েছি সু বেশ । ” এই বলিয়া উদ্যানের রক্তিম পথে রক্তিম-বরণী রাজনন্দিনী সহচারীগীদের সহিত অগ্রসর হইলেন । উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রমণীর মূ-মূর্তি, আর প্রত্যেকের পদতলে নতজাহ্ন যুক্তকর এক একটি পুরুষ মূর্তি । প্রত্যেক মূর্তিটি দেখিতে দেখিতে সহসা রাজকুমারী একটি মূর্তির সম্মুখে আসিয়া থামিলেন, বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “একি, এ কার মূর্তি ! ” তারপর পার্শ্বস্থিত এক সহচরীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এ মূর্তি নিৰ্ম্মাণ করেছে ? ”

চম্পকা নারী এক সহচরী সানন্দে অগ্রসর হইয়া বলিল, “আমি । ”

“করেছি সু কি, করেছি সু কি, ভেঙ্গে দে । এখন ভেঙ্গে দে । ভেঙ্গে দিয়ে, যদি পারিস, এ মূর্তি সিংহাসনে স্থাপন করে, পদতলে এইসব রমণী মূর্তি গুলোকে লুটিয়ে দে । ভারত-কেতন ভারত-ভাস্কর, রণ-দেবতা, পুণ্যময় পৃথ্বীরাজের চরণতলে শত রাজন্তের শির এখনও প্রণত, ভারতের নরনারী এখনও তাঁর নামে মস্তক আনত করে ; আর তুই তাঁর মূর্তি এভাবে গড়তে সাহস করেছি ? দেখছি তুই বুদ্ধিহীন—দে দে, শীঘ্র ও মূর্তি ভেঙ্গে দে । ”

অবাকভাবে চম্পকা বলিল, “মহারথী পৃথ্বীরাজকে প্রত্যক্ষ দেখা দূরের কথা ; আমি তাঁর চিত্র পর্য্যন্ত কখনও দেখিনি ।”

“তবে এ কল্পনা-মূর্তি কোথা থেকে পেলি ।”

“এ কাল্পনিক মূর্তি নয় রাজকন্না ।”

সাম্ভ্রম্যে ইন্দুজা বলিলেন, “কাল্পনিক নয়, তবে এ কার মূর্তি !”

“এ মূর্তি বিকানীরের নবাগত নব-মন্ত্রী রাঠোরবীর শিবাজীর ।”

“শিবাজীর ! এত সাদৃশ পৃথ্বীরাজের আলেখ্যে ও এই মূর্তিতে ? বাঃ, স্তম্ভর ! একটা বীরের মত চেহারা বটে । চূর্ণ কর এই নত মূর্তি । পরিবর্তে—উন্নত, ক্ষীত-বক্ষ কর, সোজা করে দাঁড় করিয়ে দে ।”

মুখরা নীলিমা এতক্ষণ মুকের কত নির্ঝাকে দাঁড়িয়েছিল একটি পাশে । এখন সে অগ্রসর হইয়া বলিল, “কেন রাজকন্না, এ বীরমূর্তি কি সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নয় ?”

“মূর্তি উপযুক্ত হলেও তার কার্য্য নয় । বিশেষ শিবাজী—জয়চাঁদের পৌত্র—রাজস্থানের কলঙ্ক—মানবের ঘৃণিত ।”

“ছিঃ মা, এমন বাক্য উচ্চারণ করে ছায়েব অসম্মান ক’রোনা !”

বিষ্ময়-চকিতা ইন্দুজা দেখিলেন, অদূরে রাজা । সহচরীরা সভয়ে ধীর-গমনে উদ্যান হইতে অন্তর্হিত হইল । নীলিমা উদ্যান ত্যাগ করিল না, তবে সুরিয়া দাঁড়াইল । মন্তুর পদক্ষেপে রাজা কন্না সমীপে আসিয়া বলিলেন “শিবাজী ঘৃণিত নয় মা,

পূজিত—বীরের আদর্শ—মানবের উচ্চ উপমা। সে তোমার পিতার প্রাণ রক্ষক, বিকানীরের বরণ্য। মা, কর্ণের চরিত্র কি বিস্মৃত হচ্ছে।? স্মৃত-পুত্রের সেই সতেজ বাক্য স্মরণ কর,—‘আমি আমার জন্মের জন্ত দায়ী নই, আমার কর্মের জন্ত দায়ী।’ শোন মা, তুমি বিকানীরের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারিনী। তোমার উপর বিকানীরের ভবিষ্যত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর কচ্ছে। প্রজার স্মৃতি দুঃখ সবই তোমার বিবেক বিবেচনায় সংলিপ্ত। বিবাহের বয়সও তোমার উত্তীর্ণ। এখন আর পুরুষের উপর তোমার এ ঘৃণা শোভা পায়না। আর জেনো, তোমার পিতাও পুরুষ। পুরুষ জাতির অবমাননায় তোমার পিতাকে অপমানিত করা কল্যাণ কার্য নয়।

“না বাবা, আমি পুরুষকে ঘৃণা করি না, কিন্তু তীক্ষ্ণতাহীন অসিকে কি কেউ সম্বন্ধে পিধানে আবদ্ধ রাখে? রাখে না। কারণ সে অপদার্থ, অকর্মণ্য। তেমনি মানুষে যদি মনুষ্য না থাকে, তবে সেও অকর্মণ্য, জগতের আবর্জনা, মাংসপিণ্ড মাত্র। বাবা, আমি কার্যকে ভালবাসি, কীর্তিকে পূজা করি, মানুষকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি। কিন্তু এ জগতে মানুষ ক’জন আছে বাবা! যে শুধু নিজের উদর পূরণের জন্ত, অর্থ সঞ্চয়ের জন্ত ব্যস্ত; যে স্বার্থের দাস, প্রবৃত্তির সেবক, সে কি মানুষ?”

“কিন্তু সবাই যদি মানুষ হয়, তা হলেও যে মানুষের আদর ও পূজা সব চলে যায়। কে কার পূজা করবে?”

“পরস্পর পরস্পরের পূজা করবে।”

“মানুষ—মানুষ হয় কিসে, ইন্দুজা ?”

“দানে, উপকারে, চরিত্রে, কর্মে, জ্ঞানে, বিদ্যায় আর প্রতি-  
ভায়। যার যা আছে, সে ইচ্ছা করলেই তার পরিপূর্ণতায়  
মানুষ হতে পারে। ধনবান—ঐশ্বর্য্য দানে পৃথিবীর দুঃখ দৈন  
বিদূরিত করুক, নিঃস্ব—পরোপকারে আত্মসংসর্গ করে বরণ্য  
হ’ক, চরিত্রবান—চরিত্রের আদর্শ দেখিয়ে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রে শৃঙ্খলা  
আনয়ন করুক, কর্মবীর—এক একটি কর্মের স্বর্ণ-সোপান নির্মাণে  
অলস অকর্মণ্যের প্রাণে নব প্রেরণা এনে দিক, জ্ঞানী—দীপ্ত  
জ্ঞানবিকাশে অজ্ঞানের হৃদয়ে আলোক বিকীর্ণ করুক, বিদ্বান—  
বিদ্যার ছটায় জগতের তামস ডুবিয়ে দিক, কবি—বাণীর ঝঞ্ঝারে  
প্রকৃতির বৃকে সুরতরঙ্গ, ভাবপ্রবাহ, আনন্দোৎস ছুটিয়ে দিক,  
গায়ক—বিশ্বে সুর-তাল-মান-লয়ে জীবের চক্ষে নূতন স্পন্দন এনে  
দিক, বক্তা—গম্ভীর জীবন্ত ভাষায় শ্রোতার হৃদয়কে উত্তেজনায়  
ক্ষেপিয়ে তুলুক, যোদ্ধা—অস্ত্রচালনায় জগতে একাধিপত্য বিস্তার  
করুক, তা হ’লেই সব মানুষ মানুষের পূজা করবে বাবা ! বীর—  
কবির বীণা নির্ঝাক-বিস্ময়ে আনন্দ-বিমুগ্ধ অন্তরে গুনবে,  
আবার কবি—বীরের অদ্ভুত অস্ত্রচালনা, অমাত্মিক শক্তি দর্শনে  
সহমপূর্ণ নয়নে বীরের প্রতি চেয়ে থাকবে, এইরূপে পরস্পর  
পরস্পরের পূজা করবে !”

“মা, দস্যুসর্দার লাক্ষ্মণলান প্রায় বিংশ সহস্র সৈন্যসহ  
বিকানীর আক্রমণোদ্দেশে কোন মতে উপস্থিত হয়েছে। এখন  
যুদ্ধ বাধবে, তাই তোমাকে সত্বর দুর্গে যাবার জ্ঞপ্তি প্রস্তুত হতে

আর উপদেশ দিতে এসেছিলুম। কিন্তু উপদেশ দিতে এসে উপদেশ নিয়ে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, তোর বাক্য এক নবশক্তি আমার প্রাণে এনে দিলে। আর তোকে কিছু বলবো না, বলবার নেইও কিছু। দুর্গে যাবার জন্ত এখনি প্রস্তুত হও মা।”

“যুদ্ধে কে কে যাচ্ছে বাবা?”

“আমি, আর সেনাপতি বিক্রমসিংহ।”

“দুর্গ রক্ষা করবে কে?”

“বিকানীরের প্রধান সচিব—রাঠোর শিবাজী।”

### একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা চঞ্জনারায়ণ ও সেনাপতি বিক্রম সিংহ উভয়ে প্রায় পঞ্চ-বিংশ সহস্র সৈন্য লইয়া দস্যু দমনার্থে দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। রাজার ইচ্ছা, ‘কলুমদে’ই লাঞ্চফুলানকে আক্রমণ করেন, একটা দস্যুকে অগ্রে আক্রমণের সন্ধান দিতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু রাজার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। বিকানীর নগর দ্বার হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র দস্যুদল প্রবল বেগে রাজ-সৈন্যের উপর আপতিত হইল। রাজা অহুমানে বুঝিলেন, দস্যুসৈন্য অধিক নহে, পঞ্চদশ সহস্র হইবে, আর তাঁহার সৈন্য সংখ্যা পঞ্চবিংশ সহস্র। উপেক্ষায় রাজা বা সেনাপতি ব্যূহ রচনা না করিয়াই

দস্যুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধান্তে দস্যু সৈন্য পশ্চাতে হটিতে লাগিল, মহোল্লাসে রাজ-সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। সহসা উভয় পার্শ্ব হইতে অশ্বপদধ্বনি উত্থিত হইয়া, উল্লসিত বিকানীর সৈন্যগণের, বিজয়োৎফুল্ল রাজা ও সেনাপতির গতি রুদ্ধ করিল। কণ্টকিত রোমাঙ্কিত দেহে, আতঙ্কিত হৃদয়ে, শঙ্কা জড়িত নয়নে সকলে দেখিল, উভয় পার্শ্ব হইতে অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য আসিতেছে। চক্ষের পলকে জলোচ্ছ্বাসের ত্রায় দূরাগত সৈন্যদল রাজ-সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সর্দার লাক্ষ্মফুলানও কেশরী বিক্রমে সম্মুখ হইতে রাজসৈন্যকে আক্রমণ করিল। দস্যুসৈন্য স্বকোশলে রাজসৈন্যের চতুর্দিক পরিবেষ্টনে, জীবন তুচ্ছ করিয়া ভীষণ ভাবে ভীমতেজে আক্রমণ করিল। সে প্রবল আক্রমণে রাজসৈন্য একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল। দূত প্রেরণে দুর্গ হইতে সাহায্যের উপায় নাই; শত্রুর এ ঘনবদ্ধ ব্যুহভেদ করিয়া জীবিত বহিষ্করণের উপায় নাই। রাজা ও সেনাপতি উভয়ে প্রমাদ গণিলেন, রাজ-সৈন্যরা যুদ্ধজয়ে নিরাশ হইয়া পড়িল। দীপ্ততেজে জলিয়া উঠিয়া অগ্নিমত বাক্যে উচ্চকণ্ঠে রাজা বলিলেন, “সৈন্যগণ! নির্দোষিত প্রদীপের মত উজ্জল হ’য়ে একবার জলে ওঠো, মরণোন্মুখের মত একবার তোমাদের জননী জন্মভূমিকে শেষ দেখে নাও, একবার তারম্বরে, কহুনাদে জলধিতল কম্পিত করে, জাতীয় গান গেয়ে নাও। একবার—শেষবার রাজপুত্রের বীরত্ব-বহির গগনম্পর্শী লেলিহান শিখায় শত্রুর অঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার

অঙ্গ দগ্ধ করে দাও ! এসো, বীর ব্রতধারী মাতৃমন্ত্র উপাসক,  
বিকানীর জননীর প্রিয় পুত্রগণ ! এসো, জীবনের ব্রত সাধন  
করতে আমার সঙ্গে এসো !”

বলিতে বলিতে রাজা উৎক্লিষ্ট তরঙ্গের ত্রায় শত্রুর উপর  
আপতিত হইলেন । পশ্চাতে ‘জয় মা ভবানী’ নামে চরাচর  
কম্পিত করিয়া উচ্চা শক্তিতে সৈন্যদল ছুটিল । রাজা তখন  
বাহুজ্ঞান বিরহিত, যেন পাগল প্রমথেশের ত্রায় শত্রু সংহারে রত ।  
সে অপূর্ণ অদ্ভুত বীরত্ব দর্শনে শত্রু মিত্র সকলেই বিস্মিত হইল,  
সে বিজলী গতি সম্পন্ন অস্ত্রচালনা দর্শনে সর্দার লাক্ষ্মফুলান  
বিচলিত হইল । বুঝিল, রাজাকে হত্যা বা বন্দী না করিলে  
তাহার এই অসংখ্য সৈন্য মুষ্টিমেয়তে পরিণত হইবে । তখন  
সর্দার লাক্ষ্মফুলান উচ্চকণ্ঠে স্বীয় সৈন্যদের লক্ষ্যে বলিল, “সর্ব-  
জয়ী সৈন্যগণ ! আজ তোমাদের গর্ব দর্প মান মর্যাদা সব  
চূর্ণ হ’তে বসেছে । যদি তা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও ; যদি বিজয়  
ভেরী বাজাতে চাও ; তবে রাজাকে সবাই একযোগে আক্রমণ  
কর, নতুবা তোমাদের গৌরব, গর্ব, প্রতিষ্ঠা—রাজার অজ্ঞাঘাতে  
শতচূর্ণ হয়ে মুক্তিকায় লুপ্তিত হবে ।”

সর্দার অগ্রসর হইল । প্রোৎসাহিত সৈন্যগণ ‘জয় মা শঙ্করী’  
ধ্বনিতে রাজসৈন্য আক্রমণ করিল । তখন উভয় দলে ভীষণ  
সংঘর্ষ হইল, পলে পলে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ নিয়তি-হৃদয়-  
বিদারক আত্মধ্বনিতে ভূ-লুপ্তিত হইতে লাগিল । রাজা উন্মাদ  
ঝঙ্কার মত ইতঃস্তুত ভ্রমণে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতেছিলেন,

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

চতুর্দিক হইতে তাহার উপর অবিরত নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হওয়ায় রাজার বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হইল, রুধীरे অঙ্গ স্নাত হইয়া উঠিল, তথাপিও রাজার স্থগিত অসি ক্ষান্ত হইল না, উপযূর্ণপরী কয়েকটা দারুণ আঘাতে অত্যধিক শোণিত ক্ষয়ে রাজা ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। হস্ত অবশ হইল, তরবারীর গতিও শিথিল হইল। তখন রাজা বাম হস্তে ঢাল ত্যাগে, উভয় হস্তে অসি ধারণে সংহার মূর্তিতে শত্রুশির কর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। সহসা শন্ শন্ রবে অদূর নিক্ষিপ্ত একটা তীর আসিয়া সজোরে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। “ওঃ, জগদীশ্বর!” বলিয়া রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। রাজসৈন্যের মধ্যে আকুল ব্যাকুল ক্রন্দন ধ্বনি উথিত হইল। নিরাশায় মগ্ন হত সৈন্যেরা পলায়ন তৎপর হইল। সেনাপতি বিক্রমসিংহ শত উৎসাহে, শত চেষ্টাতেও তাহাদের সংযত ও একত্রিত করিতে পারিলেন না। বিজয়ী দস্যুসর্দার লাক্ষ্মণ—সগর্জ হৃদয়ে, সগর্ব্ব পদক্ষেপে সাহুচর নগরের দিকে অগ্রসর হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিকানীরের প্রস্তর নির্মিত স্থ-উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গশিখ-  
রোপরি দুইটা অনিন্দ্যনীয়া সুন্দরী কিশোরী দণ্ডায়মান।  
উভয়েই রূপ-লাবণ্যময়ী, উভয়েই নয়ন মন বিমোহন-কারিণী





উজ্জল মণিময় অলঙ্কারে অপূর্ব বেশে শোভিতা, উভয়েই যুহু হাস্যময়ী। তবে প্রথমার রূপ তীব্র তীক্ষ্ণ, বেশও অন্যাপেক্ষা উজ্জল মূল্যবান। যদি সে মদন উন্মাদকর রূপ দর্শনে কেউ পাগল হয়, তাই তাঁর পদ্য বদনে ঈষৎ অবগুণ্ঠন। উভয়েই দুর্গ-শিখর হইতে যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। সহসা প্রথমা রূপসী দ্বিতীয়ার অঙ্গে যুহু কর-সংঘাতে বলিয়া উঠিলেন, “নীলিমা, নীলিমা, বাবা যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। দেখতে পাচ্ছিস না, দম্ভ্য-সৈন্য পিছু হটেছে! তুই কি দিন-কাণা?”

“না রাজকন্যা, দিন-কাণা নই, তা হ’লে কি বিক্রমসিংহের বীরমূর্ত্তি এতদূর থেকে দেখতে পেতুম? দেখদেখি, বিক্রম-সিংহের কি ক্ষিপ্তকারিতা, কি অস্ত্র চালনা!”

ঈষৎ হাস্যে রাজ-নন্দিনী ইন্দুজা বলিলেন, “তোমার চোকে বালি পড়ুক। এতই যদি বিক্রমসিংহকে মনে ধরে—”

সহসা পশ্চাতে অস্ত্র কোমের শব্দ উথিত হইল। রাজনন্দিনীর বাক্য আর শেষ হইল না। শব্দ-জড়িত হৃদয়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, এক সশস্ত্র, দীর্ঘায়তদেহ বীরমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। একি! এ যে সেই চম্পকার গঠিত মৃণ্মূর্ত্তি, সজীব প্রত্যক্ষ দেখছি! আহা, এত সুন্দর! সজীবতায় এত সৌন্দর্য্য!”

রাজকন্যা আত্ম-সংঘমে অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে অতিসূক্ষ্ম অঙ্গীকার অবগুণ্ঠন, তাঁহার দৃষ্টিকে যুবকের বদন হইতে ফিরাইতে পারিল না। যুবক অগ্ৰমুখে আসিতে

ছিলেন। সহসা দুইটা রূপসী ষোড়শীকে দুর্গ-শিখরে দণ্ডায়-  
মানা দেখিয়া, তিনিও সাস্চর্য্যে দাঁড়াইলেন। নির্ভীকা মুখরা  
নীলিমা যুবককে প্রশ্ন করিল, “কে আপনি?”

নত নয়নে যুবক বলিলেন, “আমি বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী,  
শিবাজী। উপস্থিত এই দুর্গের অধ্যক্ষ।”

রাজকন্টার বক্ষঃস্থল একটু স্পন্দিত হইয়া উঠিল, নয়নদুইটা  
আরও একটু প্রসারিত হইয়া যুবকের বীরত্ব-শৌর্য্য-মণ্ডিত  
বদনোপরি নিবদ্ধ হইল। নীলিমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, “তা  
এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?”

“ঐ দুর্গ-শিখরটা অধিকার করতে।”

“রাজ্য অধিকার করবার শক্তি হারিয়ে, এই রমণী—  
অধিকৃত দুর্গ শিখরটা অধিকার করতে এসেছেন? বা :—  
সুন্দর! চমৎকার আপনার বীরত্ব!”

শিবাজীর মুখ-মণ্ডল রক্তকমল-বৎ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল।  
কূপিত স্বরে বলিলেন, “শক্তি আছে কি না আছে, সে পরীক্ষা  
আপনার নিকট দিতে আসিনি। উপস্থিত ঐ শিখর দেশটা  
আমার বিশেষ প্রয়োজন।”

“এই দুর্গচূড়াটুকু হঠাৎ আপনার ঐত প্রয়োজন হলো  
কেন?”

“যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্ত।”

“আপনি তো মন্ত্রী, যুদ্ধের কি জানেন?”

“না জান্লেও আমি এখন দুর্গাধিপতি। প্রয়োজন বুঝলে,

রাজার সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ করতে হবে। এখন ঐ শিখর-দেশ পরিত্যাগ করুন। রাজ-আত্মীয়া জ্ঞানে আপনার প্রত্যেক প্রাণের সম্ভ্রম রক্ষা করে উত্তর দিয়েছি,—আর অধিক কৈফিয়ৎ দিতে বা বিলম্ব করতে অক্ষম আমি।”

“যদি এ স্থান পরিত্যাগ না করি!”

“বিকানীরের শত্রুবোধে আপনাদের অত্র ব্যবস্থায় স্থানচ্যুত করাতে বাধ্য হবো।”

“অর্থাৎ রক্ষী দিয়ে, কিংবা নিজে হিড়্ হিড়্ করে টেনে, আমাদের মত মস্ত বড় দু’টো বীরকে ফেলে দেবেন, এই তো?”

“আপনি বুদ্ধিমতী।”

“কিন্তু আমরা কে, তা আপনি জানেন?”

“কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। আপনারা যদি রাজ-নন্দিনী এবং বিকানীরের মহারাণীও হন, তথাপি ঐ স্থান ত্যাগে আমি আপনাদের বাধ্য করাব।”

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে উভয়েই চমকিত হইলেন। রাজ-কন্যা তিরষ্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে নীলিমার প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। নীলিমা রাজ-কুমারীর সে তিরষ্কারপূর্ণ দৃষ্টির অর্থ বুঝিল;—সেও রাজ-কন্যার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। কিন্তু মুখরার মুখ বন্ধ হইল না, সোপান অবতরণ করিতে করিতে সে বলিল, “ক্ষুদ্রা অসহায়্য রমণীর প্রতি এ বীরত্ব, আপনার ন্যায় বীরেরই শোভনীয়, অপরের নয়।”

“এ বীর

কর্তব্যজ্ঞানহীন—শুধু অস্ত্রধারী মুঢ় পশুর নিকট এ বীরত্ব অশোভনীয়। কারণ, রমণীর স্তুতি বাক্যেই তাঁহাদের রসনা চিরভাস্ত। কিন্তু নারি! ক্ষুদ্র, দুর্বল, প্রাণনাশী কীটকে সবল মানুষ এক আঘাতে সংহার না করে দংশনের স্বযোগ দেয় কি? শিশু যদি অগ্নি জ্বালায়,—বালক এসে যদি শত্রু সম্মুখে নিজের বুক পেতে দাঁড়ায়—তাহ’লে বিশ্ব জ্ঞানে তাকে বলপূর্ব্বক সরিয়ে দেওয়া কি কর্তব্য নয় নারি?”

উভয়েই শিখরনিম্নে আসিয়া উপনীত হইলেন। শিবাজী কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া দুর্গ চূড়াপরি আরোহন করিলেন। রাজকণ্ঠা এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শিবাজীর মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সে বদন হাস্যময়। ক্রমে সে হাস্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে মিলাইয়া যাইল। উৎকণ্ঠা-ব্যগ্র কণ্ঠে রাজনন্দিনী মৃদুস্বরে নীলিমাকে বলিলেন, “মন্ত্রী কি দেখছেন, জিজ্ঞাসা কর।”

আদেশানুযায়ী নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, “কি দেখছেন মন্ত্রীপ্রধান?”

দেখছি—শত্রুসৈন্য সংখ্যায় রাজ-সৈন্যের চতুঃগুণ।”

“সেকি! ভুল দেখেছেন, শত্রুসৈন্য রাজসৈন্যের সংখ্যায় অতি অল্প। দস্যু-সৈন্য পলায়ন তৎপর।”

“সেটা দস্যু-সর্দারের কৌশল, সে আমাদের চক্ষে ধূলি

দিয়েছে। তার অসংখ্য সৈন্য বালুস্তূপ ও প্রস্তর স্তূপের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল, এখন স্বযোগ বুঝে একযোগে সবাই রাজাকে আক্রমণ করেছে। সর্বনাশ! সর্বনাশ উপস্থিত!”

“কি?”

“রণোন্মাদ রাজা একাকী শত্রুবাহু মধ্যে প্রবেশ করছে। সহস্র তরবারী তাঁর শিরোপরি উখিত,—আর মুহূর্ত বিলম্বে বিকানীরের সব যাবে। আমি চলুম।”

বলিতে বলিতে দুর্গ-শিখর হইতে শিবাজী লম্ব প্রদান করিলেন। শঙ্কাকুলিতহৃদয়া পিতৃ-ভক্ত রাজ-বালার অবশুষ্ঠন সরিয়া গেল। শঙ্কিত কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, “হে বীর-শ্রেষ্ঠ! এই মুহূর্তে আপনার তেজস্বী অশ্ব ছুটিয়ে দিন। যদি আমার বৃদ্ধ পিতাকে, বিকানীরের মৃতপ্রায় গৌরবকে দৃশ্য কবল হতে পুনঃ জীবিত করতে পারেন,—তবে আমার এই কণ্ঠহার, এই সমুদয় অলঙ্কার আপনাকে উপহার দোবো।”

গমনোদ্যত শিবাজী একবার রাজনন্দিনীর প্রতি চাহিলেন; সে মূর্তি দর্শনে শিবাজীর হৃদয় মুহূর্তের জ্ঞাত বিচঞ্চল হইয়া উঠিল। চলিতে চলিতে শিবাজী বলিলেন, “রাজপুত কখনও কোনও স্বার্থের জ্ঞাত বা উপহারের প্রলোভনে কার্য্য করে না রাজকন্যা। এ আমার কর্তব্য কার্য্য, আমি করবোই, হৃদয়ের শোণিত বিনিময়েও আপনার পিতাকে, আমার গৌরবময় রাজাকে উদ্ধার করবোই।”

শিবাজী অতিদ্রুত গতিতে চলিয়া গেলেন।

### ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

শিবাজী পূর্বাঙ্কেই দুর্গে বিংশ সহস্র সৈন্য স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন । পঞ্চসহস্র সৈন্য রক্ষার্থে রাখিয়া ; পঞ্চাদশ সহস্র সৈন্যসহ দুর্গ হইতে নিজ্জান্ত হইলেন । মধ্যপথে পলায়িত রাজসৈন্যের নিকট রাজার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শিবাজী মুহমান কাতর হইয়া পড়িলেন ;—কিন্তু সে মুহর্তের জন্য । কাতরতার স্থানে ক্রোধ ও প্রতিশোধ আকাজ্জায় ক্ষিপ্ত হৃদয়ে পূর্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত গতিতে অগ্রসর হইলেন । সহসা শিবাজী দেখিলেন, অদূরে এক তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠোপরি এক তেজ-সম্পন্ন যুবক বায়ু গতিতে আসিতেছেন । নিকটে আসিলে শিবাজী অশ্বারোহীকে চিনিলেন, বজ্রকণ্ঠে শিবাজী ডাকিলেন, “সেনাপতি বিক্রমসিংহ ?”

অতি বেগগামী অশ্ব, সেনাপতির রশ্মি আকর্ষণ সত্ত্বেও অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িল । পুনরায় অশ্ব ঘুরাইয়া শিবাজীর সম্মুখে আসিয়া সেনাপতি অশ্বগতি রোধ করিলেন । পূর্ববৎ কণ্ঠে শিবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীরকুল শ্রেষ্ঠ, মহা-ধুরন্ধর সেনাপতি বিক্রমসিংহ ! তোমার বিজয়শ্রী-মণ্ডিত ললাট কুণ্ঠিত কেন ? সদা উন্নত মস্তক য়ান নত কেন ?”

নত ভাবেই অশ্লুচকণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, “উন্নত মস্তক আজ নত করে দিচ্ছে মন্ত্রী ।”

“নত করে দিচ্ছে ! কে সে মরণ-বিজয়ি ?”

“দেহ্যসদার লাক্ষফুলান ।”

“একটা দস্যু তোমার মস্তক নত করে দিয়েছে, আর তুমি সাস্ত্রনার জন্য বৃষি অন্তঃপুরে রমণীর বসনাঙ্কলে যাতনার অশ্রু মুছতে যাচ্ছ ? এই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যময় দেহটায় এত মমতা তোমার ?”

“বৃথা অভিযোগ, অন্যায় তিরস্কার করছেন সচীব। রাজার মৃত্যুতে সৈন্যেরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, আমার শত চেষ্টা সমস্ত উদ্যমও তাদের একত্রিত করতে পারলে না।”

“তুমিও কেন রাজার সঙ্গে সেই মহান দেশে চলে গেলে না সেনাপতি ? রাজাকে রণস্থলে শুইয়ে রেখে একাকী কলঙ্কিত মুখ নিয়ে প্রত্যাবর্তনে তোমার মৃত্যু ইচ্ছা জাগল না, আশ্চর্য্য ! কি আর বলবো তোমায় সেনাপতি, কোন্ ভাষায় তোমায় ধিক্কার দোবো,—তোমায়, না থাক, আমি চল্লুম সেনাপতি।”

বেদনা-পূর্ণ কাতর কণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, “সত্যই আমি ধিক্কারের অতীত। রাজা নেই, আমার পিতা নেই, অথচ আমি জীবিত ! শুহুন মন্ত্রী প্রতিজ্ঞা আমার। রাজার প্রাণনাশের প্রতিশোধ নোব। বিকানীর বক্ষে শোণিত তরঙ্গ প্রবাহিত করবো, বিকানীরের বালুস্তূপ রক্তিমবর্ণ ধারণ করবে, দস্যুসৈন্যের শবদেহে পর্কত নির্মাণ করবো। হত্যার প্রতিশোধ—হত্যা ! শোণিতের বিনিময়—শোণিত চাই ! ছোটোর—হত্যার তাণ্ডব লীলা ছোটাব।”

“তবে এস বীর, এস সেনাপতি, দস্যুসর্দারের রক্তাক্ত কবন্ধ এনে শোক সন্তপ্ত রাণীর পদতলে উপহার দিয়ে তাঁকে সাস্ত্রনা করতে হবে।”

উভয়ে বিদ্যুৎগতিতে অশ্ব ছুটাইলেন। নগরদ্বার সন্নিবর্তে উপনীত হইয়া শিবাজী দেখিলেন,—সাহুচর লাক্ষফুলান দ্বার পথে প্রবেশোদ্যত। জলদ গম্ভীরকণ্ঠে শিবাজী আদেশ করিলেন, “দ্বার রুদ্ধ কর।” তন্মুহূর্ত্তে সশব্দে বিশালকায় লোহদ্বার রুদ্ধ হইল। শিবাজী তখন স্বীয় সৈন্যগণকে লক্ষ্যে বলিলেন, “সৈন্যগণ! রজ্জু ও কাষ্ঠ-সোপান প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন কর। একলিঙ্গ দেবের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ সহস্র তীর ধনুকধারী সৈন্য প্রাচীরোপরি উঠা চাই-ই।”

সেই দণ্ডে দুর্গাভিমুখে পবনবেগে কয়েকজন সৈন্য ছুটিল। অবিলম্বে তাহারা বহু কাষ্ঠ ও রজ্জু-সোপান লইয়া আসিল। প্রাচীরগাত্রে পঞ্চসহস্র সোপান সংলগ্ন হইল। পঞ্চ সহস্র তীরধনুকধারী সৈন্য শিবাজীর আদেশ প্রতীক্ষায়, সোপান পদস্পর্শে দণ্ডায়মান হইল।

শিবাজী আদেশ স্বরূপ একলিঙ্গদেবের জয়ধ্বনি করিলেন। অমনি সেই তীরধনুকধারী পঞ্চসহস্র সৈন্য একলিঙ্গদেবের নামোচ্চারণে প্রাচীরোপরি উঠিয়া, অব্যর্থ লক্ষ্যে শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিল। শিবাজী ও বিক্রমসিংহ নগরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া—সু-উচ্চ পর্বত নিঃসৃত জলধারার ন্যায় শত্রুর উপর নিপতিত হইলেন। সে প্রবল প্রাবনে দস্যু সৈন্য ভূ-লুপ্তিত হইতে লাগিল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ায় সর্দারও কিং-কর্তব্যমিচ্ছ হইয়া পড়িল। পলে পলে তাহার সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। শিবাজীর ব্যূহ রচনা দর্শনে লাক্ষফুলান



বুঝিল, এ বাহ ভেদ তাহার অসাধ্য। চিরবিজয়ী চিরনিভীক অক্ষুণ্ণ প্রতাপশালী দস্যুসদাঁর লাক্ষফুলানের বক্ষও শঙ্কায় বিকম্পিত হইয়া উঠিল। রোষে ক্ষোভে জ্বলিতে জ্বলিতে উন্নতের ন্যায় সদাঁর রাজসৈন্য শ্রেণীভেদ করিয়া শিবাজীকে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়া গর্জ্জনময় ভাষায় বলিল, “রাঠোর বীর, একবার শৃংগালের ন্যায় ভীকৃতার আশ্রয়ে আমায় পরাজিত করেছিলে, কিন্তু আজ আর তোমার নিস্তার নেই, ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর যুবক। এই মুহূর্ত্তেই তোমার জীবনের যবনিকা পতিত হবে।”

লাক্ষফুলানের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া শিবাজী বলিলেন, “বাক্য আর কার্য এক হয় না দস্যু। শিবাজী বালক নয়; বাক্যের গর্জ্জনে সে ভীত হয় না। স্পর্ধিত দস্যুসদাঁর! রাঠোরের হৃদয় বা হস্ত যে দুর্বল নয়, তোমার বক্ষ-শোণিতে, অসি-ফলকে এ কথা রাজস্থানের মুক্তিকায় খোদিত করবো। সাধ্য থাকে, আমার আক্রমণ ব্যর্থ কর বাক্য-বীর।”

সত্যই সদাঁর, শিবাজীর সে ভীষণ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিল না। অস্ত্রবিদ্ধ হৃদয়ে, রাজস্থান দর্প-হারী মহাঅত্যাচারী সদাঁর লাক্ষফুলান অশ্বপৃষ্ঠোপরি হইতে ভুলুঙিত হইল। একটা সজীব অত্যাচারের মূর্ত্তি, প্রবল একটা শক্তি চিরতরে নিব্রিত হইল, চিরতরে একটা মহাদম্ভ—অশান্তির অনল অনন্ত-সলিলে নিকীর্ণপিত হইল।

## দ্বিতীয় খণ্ড ।



### প্রথম পরিচ্ছেদ ।

কান্যকুব্জের এক সুবৃহৎ প্রাসাদের দ্বিতলোপরি শত আলকো-  
জ্জল স্নশোভিত, পুষ্প-স্বরভিত নয়নাভিরাম কক্ষে দুইটি তরুণ  
যুবক একখানি বহুমূল্য কোমল আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া  
কথোপকথনে রত । উভয়েই বহুমূল্যবান বেশে ভূষিত, উভয়েই  
সশস্ত্র । যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন পাঠান, অপরটি রাজপুত ।  
পাঠান যুবকটির পার্শ্বে আজাদ আলি নামক তাঁরই এক প্রিয়  
অনুচর মণ্ডপাত্র ধারণে দণ্ডায়মান । পাঠান যুবকটি মধ্যে মধ্যে  
মদিরা-সুন্দরীর উপাসনা করিতেছিলেন । এই যুবকদ্বয় বড়  
সামান্য ব্যক্তি নন । পাঠান যুবকটি ভারতবর্ষের ভবিষ্যত  
উত্তরাধিকারী বর্তমান ভারত-সম্রাট শাহবুদ্দীনের প্রতিনিধি—  
অথবা পাঠান সেনাপতি মহা শৌর্য বীৰ্য্যশালী বহু বৃদ্ধজয়ী  
—নাসীরুদ্দীন কবাচার । আর হিন্দু যুবকটি—বিকানীর-রাজ্ঞী  
রাণী প্রতিভাময়ীর সহোদর, রাও মহীপতি ।

গম্ভীরাননে মহীপতি পার্শ্বোপবিষ্ট পাঠান সেনাপতিকে  
লক্ষ্যে বলিলেন, “শুনুন সেনাপতি, রাজ্যের এই সহসা মৃত্যুতে  
বিকানীর-সিংহাসন শূন্য । সেনাপতি বিক্রমসিংহ অথবা মন্ত্রী

শিবাজী, এই দু'জনার মধ্যে একজন সিংহাসন অধিকার করবেন। আমার ভগ্নী, প্রজা-সাধারণের উপর প্রতিনিধি নির্বাচনের ভারার্ণ করেছেন। প্রজাদের নিকট আমি একরূপ অপরিচিত, তারা সেনাপতি ও মন্ত্রী এই দু'জনার মধ্যে একজনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।”

“অধিক সম্ভাবনা কার ?”

“মন্ত্রী শিবাজীর।”

“আর বিকানীরের শক্তিমান সেনাপতি নীরব থাকবে, একি সম্ভব !”

“শুধু নীরব থাকবেন না, শিবাজীর সিংহাসন লাভের জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী ও সহায়। যদিও আমার পরামর্শে আমার চেষ্টায় সামন্ত রাজগণ শিবাজীর বিপক্ষে, তথাপিও আমার বিশ্বাস, সেনাপতির চেষ্টাই সফল হবে। এই শিবাজী যেমন বুদ্ধিমান, তেমন শক্তিবান। পথের ভিক্রুক থেকে নিজের শক্তিতে নিজের বিচক্ষণতায় সে আজ বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী—হয়তো বিকানীর সিংহাসনে বসবে। শিবাজীর অস্ত্রে বিদ্যুৎ খেলে, নয়নের তারায় অগ্নি জলে। সে যদি একবার কোন রকমে সিংহাসনে বসতে পায়, তাহ'লে বিক্রম-সিংহের সহায়ে এমন সুদৃঢ় লৌহ প্রাচীরে বিকানীর রাজ্য ঘিরে ফেলবে যে, তখন আপনার শত সহস্র সুশাণিত অস্ত্র প্রহার, সে লৌহ-ভিত্তিতে প্রতিহত হবে।”

“হুঁ, তাহলে এখন কি করা কর্তব্য বিবেচনা করেন ?”

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

“শিবাজীকে বিকানীর সিংহাসনে বসতে দোবনা, এটা স্থির জানবেন। তাকে বিকানীরের কারাগারে বন্দী করাব।”

“কি প্রকারে?”

“আমার কৌশলে,—আর আপনার সহায়তায়।”

বিস্ময়স্থচক কণ্ঠে সেনাপতি বলিলেন, “আমার সহায়তায়! আপনার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না।”

“এ আর বুঝতে পাচ্ছেন না? আমি প্রমাণ করাব যে, শিবাজী বিশ্বাসঘাতক, সে আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে। এই গুরুতর অপরাধে তার সিংহাসন লাভে বাধা দোবো, তাকে বন্দী করাব। আমার বিকানীর-রাজ্যের আদেশ এবং সমস্ত রাজগণের সহায়তায় আমিই বিকানীর সিংহাসনে বসব; তখন আপনার বিকানীর জয়ে একটা প্রাণীহত্যা বা একবিন্দু শোণিত ক্ষয় হবে না। আপনার আক্রমণেই আমি সন্ধিস্থাপন পূর্বক আপনার বশুতা স্বীকার করে, কর প্রদান করব। এখন আপনার সাহায্য পেলেই আমার ও আপনার কার্য্য সিদ্ধি হয়।”

“এ অতি সুন্দর যুক্তি। আমি আপনার সহায়তার জন্য প্রস্তুত। কি করতে হবে, বলুন!”

“শুভুন, তবে। প্রথমে বিক্রমসিংহের উপর সন্ধিহান ও সামন্তরাজগণের বিপক্ষতায় ভীত হয়ে, শিবাজী যেন আপনার সহায়তা লাভের জন্য আপনাকে পত্র লেখে। আপনি তাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়ে, বিকানীর আক্রমণ করবার জন্য শিবাজীর নিকট পত্র লিখছেন—আপনার স্বাক্ষরিত এইরূপ

একখানা পত্রের প্রয়োজন, আপনার এই পত্রই তাকে কারাগারে টেনে আনবে।”

“দেখছি আপনি কৌশলী, অতি বুদ্ধিমান। উত্তম, পত্র লিখে দিচ্ছি।”

“ঈদ্রিতে আজাদআলি লিখনির সুরঞ্জাম আনয়নে প্রভুর সম্মুখে ধারণ করিল, লেখনি গ্রহণে সেনাপতি পত্রে লিখিলেন—

ভবিষ্যৎ বিকানীর অধিপতি বীরবর শিবাজী।—

আপনি, সেনাপতি বিক্রমসিংহের প্রতি সন্দিহান হইয়া ও সামন্তরাজগণের বিপক্ষতাচরণে, বিকানীর সিংহাসনলাভ অসম্ভব বোধে—আমার সাহায্য লাভার্থে যে পত্র লিখিয়াছেন, সে পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আপনার ভ্রাতৃ বীরের সাহায্য করা গৌরবের কথা। আপনি বিকানীর প্রধান মন্ত্রী। ভ্রাতৃত্বঃ ধর্ম্মতঃ রাজ্যের অবর্ত্তমানে বিকানীর সিংহাসন আপনারই, শুধু তাই নয়—বিভাগ্য, বুদ্ধিমত্তায়, বিচক্ষণতায় বিকানীর সিংহাসনের আপনিই উপযুক্ত। আমি অতি আনন্দের সহিত আপনাকে আমার যথাশক্তি সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি। কখন, কোন্ সুযোগে, কোন্ পথে আক্রমণ করিতে হইবে জানাইবেন; আপনার আদেশ মাত্র বিকানীরের দ্বারে আমার অস্ত্রবকার ধ্বনিত হইবে।

ইতি—

ঐতিহাসিক পাঠান সেনাপতি, নাসির উদ্দীন কবাচার।

লিখন সমাপ্তে সেনাপতি পত্রখানি মহীপতির হস্তে প্রদান করিলেন। আগ্রহে পত্র গ্রহণে—ততোধিক আগ্রহে পত্র পাঠান্তে সরল-হাস্তে মহীপতি বলিলেন, “বাঃ, এ অতি উত্তম লেখা হয়েছে—হ্যাঁ, আর একটু সাহায্য আপনাকে করতে হবে।”

“কি বলুন!”

“আপনার এই আজাদ আলিকে আমার প্রয়োজন।”

“কেন?”

“আমি দেখাব, আজাদ যেন এই পত্রের বাহক। শিবাজীকে ছদ্মবেশে পত্র দিতে বিকানীয়ে এসেছিল, আমি সন্দেহে তাকে ধৃত করে এই পত্রখানি পাই। তাতে আর কারও সন্দেহ হবেনা।”

কম্পান্বিত কলেবরে—কম্পগম্বুজ স্বরে আজাদ বলিয়া উঠিল, “হ্যাঁ! আমি কেন—আমি কেন! আমার উপর এ মেহেরবাণী কেন! জাঁহাপনার তো আরও অনেক লোক রয়েছে, তাদের উপর এ মেহেরবাণী করুন না।”

আজাদকে আশ্বাসিত করিবার জন্য মহীপতি বলিলেন, “ভয় নেই আজাদ, দূত বা গুপ্তচর রাজপুত্রের অবধ্য। আর আমি যখন রয়েছি, তখন তোমার কোন শঙ্কা নেই, শুধু তাই নয়; এতে তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে।”

“না না, তা বলছিনা, তা বলছিনা, তবে কিনা—এই তবে কিনা—এই বুঝেছেন কি না, তা আমি এই নূতন সাদী করেছি কিনা? তা আপনি যখন বলছেন, তখন যমের বাড়ীভেঙে যেতে পারি।”

মহীপতির প্রতি প্রশংসাসূচক দৃষ্টিক্ষেপে সেনাপতি বলিলেন, “চমৎকার কোশল আপনার! আজাদ, নর্তকীদের ডাক, নৃত্যগীতে রাজশ্যালকের চিত্ত বিনোদন করুক।”

“আজ্ঞে হাঁ-জাঁহাপনা, সেটা চাই বই কি।”

আজাদ কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং অনতিকাল মধ্যে একদল সেনাপতির বেতনভুক্ত নর্তকীসহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “এস এস, রূপসী প্রেয়সী মহিষীরা এস, কুরঙ্গ-লোচনা, বিদ্যুৎ-বরণী, পুরুষ সংহারিনী বাঈজী বিবিরাস এস। জাঁহাপনা! এই নিম্ন—মেওয়ার দল, চিড়িয়ার পাল এনেছি। নাও, নাও—ছরী বিবিরাস নাচ, কোকিলের ঝঙ্কার তোল, গাও, ক্ষুণ্ণি ওড়াও, প্রেম ছোটোও, দিল বিলাও, দিল নাও;—বাজুক নূপুর ঝুম-ঝুমঝুম।”

নূপুর ধ্বনিতে, হস্ত-কল্লোলে, বাজ-ঝঙ্কারে কক্ষ মাতিয়া উঠিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুনির্মল প্রভাতে পুষ্প-সৌরভ-প্রাবিত নয়নাভিরাম শয়ন কক্ষে অমল-ধবল শ্বেত মর্মরোপরি বিস্তৃত এক বহুমূল্য আসনে রাজনন্দিনী ইন্দুজা উপবিষ্টা। রাজকন্টার সম্মুখে কতিপয়

আলেখ্য পতিত, কেবল একখানি সশস্ত্র বীরের তৈলচিত্র তাঁর দক্ষিণ হস্তে, আর বামদিকে রাজকুমারীর স্বহস্ত-গ্রথিত এক পুষ্প মালা বিরহিনীর হ্রায় ভূপতিতা। রাজতনয়া কখনও আলেখ্য রাখিয়া পুষ্প-অঙ্গুলী সঞ্চালনে পুষ্পে পুষ্পে সংযোজনা করিতে-ছিলেন, আবার কখনও পুষ্প নয়ন দু'টিতে বীরের মূর্তি দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে হাস্ত-রঞ্জিত-অধরা এক কিশোরী ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিঃশব্দে রাজকন্যার সম্মুখে উপবেশনে কোমল মধুসিক্তকণ্ঠে বলিল, “রাজকন্যা, দেখে ফেলেছি।”

ভূপ-বালা ত্রস্তে পুষ্প মালা ও আলেখ্য লুকাইয়া হাস্তযুক্ত বদনে বলিলেন, “কি দেখে ফেলেছি নীলিমা?”

“তোমার ঐ লুকান মালা ও ছবি।”

“ছবি দেখায় কি এত অপরাধ যে, তোকে দেখে লুকোবো।”

“দেখায় অপরাধ নেই, কিন্তু গোপনে দেখায় অপরাধ। রাজ-কন্যা, বলবে?”

“কি?”

“ও ছবিখানি কার?”

“বোলবো না।”

“তুমি না বললেও আমি বুঝেছি, ও ছবি রাঠোর-শিবাজীর।”

“তোমার মরণ!”

“তা হোক, তোমার যে পতিবরণ! গোপনে আবার



মালাও গাঁথছিলে। এ মালা কার জন্তে গাঁথছিলে রাজ-  
কুমারি !”

“তোমার জন্ত প্রিয়তম ।”

“সত্য বলবো, কার জন্ত মালা গাঁথছিলে ?”

“বল্ দেখি !”

“তোমার সম্মুখস্থিত রাষ্ট্রের বীরের প্রতিমূর্তির কণ্ঠে  
পর্যাবার জন্ত । রাজকন্যা ! যে পুরুষকে—যুগায় অবজ্ঞায় যুক্ত করে  
রমণীর চরণে লুপ্তিত করেছিলে, আজ সেই পুরুষের মৃ-মূর্তির  
সম্মুখে তুমিই ভিখারিণীর ন্যায় উপবিষ্টা, একি বিপরীত রঙ্গ  
রাজবালা !”

“এ বিপরীত রঙ্গ নয়, এ বীরত্বের পূজা ।”

“এ বীরত্বের পূজা নয়, এ প্রেমের পূজা ।

“প্রেমপাগলিনী, তুমি যমের সঙ্গে প্রেম করবে যাও ।”

এই বলিয়া রাজকুমারী স্বীয় কুসুম-কোমল কুসুমকরে একট  
কুসুম লইয়া সহচরী নীলিমার কুসুম অপেক্ষে নিক্ষেপ করিলেন ।  
কুসুম-অঙ্গস্পর্শে কুসুমটী ভূমে পতিত হইল, তাহার পল্লব খসিয়া  
পড়িল । কলহাস্যে নীলিমা বলিল, “দেখলে রাজকন্যা ?”

“কি ?”

“এই কুসুমের কোমলতা একটু মাত্র আঘাতও সহ করতে  
পারলেনা, বীরের পড়িল । রমণীও ঠিক এই কুসুমেরই মত  
কোমল । সামান্য আঘাতের ভারও সহ করতে পারেনা,  
একটু তিরস্কারে, একটু অনাদরে শুকিয়ে যায়, অভিমানে

হৃদয় কেঁপে ওঠে, অশ্রুর নদী স্রষ্ট করে। তাই পুরুষ রমণী-  
কুসুমকে সযত্নে, আদরে, প্রেম বারিসিঞ্চিত করে রাখে, পাছে  
না ঝরে পড়ে—না শুকিয়ে যায়।”

নত নয়নে রাজকন্যা চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,  
“তাই কি? নীলিমা, তাই কি?”

“হাঁ—তাই।”

“নীলিমা!”

“কেন রাজনন্দিনি?”

“মনে পড়ে?”

“কি?”

“তোর সেদিনের সে কথা মনে পড়ে?”

“পড়ে।”

“নীলিমা, তোর কথাই ঠিক হলো, তুই-ই জিতলি, সত্যি  
আজ আমি পরাজিত।”

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিকানীর আজ পরিণয়ের পাত্রীর ন্যায় অতুল শোভায় সাজি-  
যাচ্ছে। পুষ্পে পতাকার হাস্য-হিল্লোলে আনন্দ-কল্লোলে বিকা-  
নীর আজ মাতোয়ারা! সুবিশাল সুসজ্জিত রাজ-দরবার লোকে  
পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে শূন্য রত্নময় সিংহাসন—সিংহাসনের উভয়

পার্শ্বে সেনাপতি বিক্রমসিংহ ও মন্ত্রী শিবাজী দণ্ডায়মান। সিংহাসনের সোপান সন্নিকটে এক প্রবীন সামন্তরাজ দণ্ডায়মান। সম্মুখেরাজন্যবর্গ, সর্দার ও সামন্তগণ এবং সম্ভ্রান্ত প্রজামণ্ডলী উপবিষ্ট। বিরাট জনময় দরবার গৃহ নীরব চঞ্চলতা হীন। দণ্ডায়মান প্রবীন সামন্তরাজ মহীপতির পক্ষে মহীপতির দোসর। শিবাজীকে লক্ষে উক্ত সামন্তরাজ বলিলেন, “রাঠোর বীর! আপনি এই বিশাল রাজ্যের মন্ত্রী, কর্ণধার। আপনারই মন্ত্রণার উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল স্থাপিত। সুতরাং আপনিই প্রথমে—কে এই সিংহাসনের উপযুক্ত অহুমোদন করুন, আপনার অভিমত শুনতে আমরা সকলেই উৎসুক।”

শিবাজী জলধি-গর্জ্জনবৎ কণ্ঠে বলিলেন, “আমার অভিমত, শৌধ্যে বীৰ্য্যে, কর্ম-দক্ষতায় যে বিকানীর রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বিকানীর সিংহাসন তাঁরই। বিক্রমসিংহই বিকানীর সিংহাসনের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।”

শিবাজীর গুরু গণ্ডীরধ্বনি নীরব হইল। নীরব দরবার গৃহে মুহূ আনন্দ-কল্লোল উথিত হইল। তদৃষ্টে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, “শুনুন আপনারা, বিকানীরের মধ্যে শিবাজীই শ্রেষ্ঠ বীর, আদর্শ চরিত্র, মহান পুরুষ, বিকানীর সিংহাসনে অধিকার একমাত্র তাঁর। আপনাদের কি অভিমত জানতে চাই।”

সামন্তরাজ তদন্তরে বলিলেন, “আমি সমস্ত সামন্তরাজ ও প্রজাবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপ বলছি, শিবাজী বিকানীর সিংহাসনে

অভিষিক্ত হ'তে পারেন না। আমরা তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে সম্মত নই।”

বিক্রমসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কারণ জানতে পারি কি?”

“কারণ—শিবাজী নবীন যুবক, অপরিপক্ব বুদ্ধি, রাজ্য শাসন করা বালকের খেলা নয়।”

“তা জানি সামন্তরাজ, কিন্তু এ উক্তিও আপনার মুখে শোভা পায় না।”

“কেন?”

“জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির সঙ্গে বয়সের সম্বন্ধ নেই, এ কথাটা স্মরণ রাখবেন।”

“তা না হ'লেও শিবাজীর জন্মস্থান বিকানীর নয়, বিকানীরের প্রতি তাঁর মমতা, ভক্তি বা শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। আপনি বিকানীর সিংহাসনে বসুন, আমরা স-সন্ত্রমে মাথা নোয়াব, জয়-গানে আকাশ মুখরিত করবো।”

“স্বীকার করি, শিবাজীর জন্মস্থান বিকানীর নয়, কিন্তু রাজ-স্থান তো বটে! আর এ উক্তি শিবাজীর জন্ম নয়, অপরের জন্ম। শিবাজীর হৃদয় সঙ্গীর্ণ বা গভীরতার মধ্যে আবদ্ধ নয়; শিবাজীর হৃদয়—শিবাজীর কার্য্য গোরব-মণ্ডিত, হিরণ-কিরণ-ভূষিত। তা না হ'লে বিকানীরের জন্ম তিনি হৃদয়-শোণিত উৎসর্গ করতেন না, স্বেচ্ছায় শত্রু তরঙ্গে ঝাঁপ দিতেন না। বিকানীরের সিংহাসন তাঁর নিকট ঋণি, আর বিশেষতঃ শিবাজী

যখন বিকানীরের প্রধান মন্ত্রী, তখন সিংহাসনে তাঁরই অধিকার।”

“সব বুঝি সেনাপতি, তথাপি রাজপুতানার মহা শত্রু, রাজপুত জাতির মহাকলঙ্ক জয়চাঁদের পোজ বিকানীর সিংহাসনে কিছুতেই বসতে পারেন না। তা হলে বিকানীরেও জয়চাঁদের রোপিত বৃক্ষের বিশ্বাসঘাতক ফল ফলতে-পারে।”

ক্রোধপূর্ণ-কণ্ঠে বিক্রমসিংহ বলিলেন, “একটু সাবধানতা সহকারে বাক্য-প্রয়োগ করবেন সামন্তরাজ। তর্কে আমার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন—শিবাজীকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করান। আমি শুদ্ধ জানতে চাই, আপনাদের সকলেরই কি এক মত?”

অনেকেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “একমত।”

বিক্রমসিংহ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “আর আমি যদি সিংহাসনে উপবিষ্ট হই?”

সম্মুখে উত্তর হইল, “আমরা অবনত মস্তকে আপনাকে রাজা ব’লে স্বীকার করুবো।”

“উত্তম।” বিক্রমসিংহ ধীর পদক্ষেপে সোপানাতিক্রমে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। অমনি শত সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “জয় বিকানীর অধিপতি—রাজা বিক্রমসিংহের জয়।”

জয়-ধ্বনি নীরব হইলে বিক্রমসিংহ স্ব-উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, “সামন্তরাজগণ, রাজকুলবর্গ, সম্ভ্রান্ত প্রজামণ্ডলি! আপনাদের ইচ্ছানুসারে আমি বিকানীর সিংহাসনে বসেছি! আমার আদেশ রাজার আদেশের মতই আশা করি আপনারা অবনত শিরে

শ্রায়-অন্যায় না বিচার ক'রে গ্রহণ করবেন। আর একটা কথা, সিংহাসন সম্পূর্ণভাবে আমার ?”

শত কণ্ঠে উত্তর হইল, “নিশ্চয়ই।”

“উত্তম, তবে রাজার অধিকার নিয়ে পূজনীয়া মহারাজার নাম স্মরণে এ সিংহাসন আমি শিবাজীকে প্রদান করবুম।”

বিক্রমসিংহ সিংহাসন ত্যাগে নিয়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুগ্ধ দর্শক, মুগ্ধ-নয়নে বিক্রমসিংহের পূণ্য-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিল। মুগ্ধ শিবাজী, মুগ্ধ হৃদয়ে বলিলেন, “একি নূতন ছবি, নূতন মূর্তি প্রকটিত করলে সেনাপতি! এ যে ধারণার অতীত, সাধনার দ্রব্য। যেন মহেশ্বরের পূণ্য-প্রবাহ, স্বর্গের আলোক-প্রপাত। এই অতুল সম্পদ, অতুল সম্ভ্রম উপেক্ষা করে, একটা সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বর পদ অবহেলায় দলিত করে, বিকানীরের ঘড়ৈশ্বৰ্য্যমণ্ডিত সিংহাসন ধূলিকণার মত যে বিলিয়ে দিতে পারে, সে মানুষ নয়, দেবতা—বুঝি তারও বড়। সেনাপতি, বন্ধু, তোমার স্পর্শস্থখে আমাকে ধন্য কর।”

বিমুগ্ধ শিবাজী, বিক্রমসিংহকে আলিঙ্গন করিলেন। দুইটা করুণা-মহত্বপূর্ণ-হৃদয় এক হইল। সকলে নির্নিমেঘে ক্ষণিক সে মিলন নীরবে দেখিল। আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া সেনাপতি কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিলেন, “মানুষ যদি হয়ে থাকি, তবে তোমারই করুণার হয়েছি। তুমিই আমায় স্বর্গের আলোক দেখিয়েছ, ধর্ম্মের ভেরী তুমিই আমায় শুনিয়েছ। তুমি প্রভু, আমি ভূত্য, তুমি গুরু, আমি শিষ্য। শিষ্য বহুমূল্যবান বেশে

বিতুষিত হ'য়ে মগ্নি-মাণিক্য-খচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাক্বে, আর গুরু সিংহাসন নিম্নে, শিষ্যের আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাক্বে! এ অস্বাভাবিক কখনও হ'তে পারে না। দ্বিকল্পিত ও অহুরোধ না ক'রে সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক সিংহাসনের শোভা সম্পাদন কর; তোমার আদেশ পালনে ধন্য হই।”

“মহানুভব সেনাপতি, যতদিন বিকানীর থাক্বে, ততদিন তোমার এ কীর্তি বিলুপ্ত হবে না। তোমার নামে শিশুর অধরে হাস্য ক্ষুরিত হবে, ব্যধিগ্রস্থ রোগীর যন্ত্রণার উপশম হবে, সকলে স-ভক্তিতে তোমার নামে মাথা নোয়াবে। যাও ভাই, সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে মহত্বের উজ্জ্বল আলোক প্রভায় সমগ্র বিকানীর প্রাবিত কর, সে আলোকে বিকানীর রাজ্যের অন্ধকার বিদূষিত হোক, বিকানীর অজ্ঞানত হৃদয়ে তোমার দেবোপম বীরমূর্ত্তি পূজা করুক।”

“শিবাজী, রাজা কে?”

“একমাত্র তুমি।”

“রাজা ব'লে আমার স্বীকার কর?”

“সহস্রবার করি।”

“বিকানীরের রাজা সকলের প্রভু?”

“শুধু প্রভু নয়,—দেবতা।”

“রাজ্যাদেশ পালনে সকলে বাধ্য কি না?”

“রাজ্যদেশে সকলে জীবন দানেও বাধ্য।”

“উত্তম, তবে আমার আদেশ; সিংহাসনে উপবেশন কর।”

“পরাজয় স্বীকার করলুম। বেশ, তবে তাই হোক।”

শিবাজী সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সামন্তরাজ অথবা অন্য কেহই বাধা দানে বা আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। মহীপতি অতি দ্রুতবেগে মহীপতি দরবার গৃহে প্রবেশ পূর্বক সিংহাসন সন্নিহিত আসিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধনে বলিলেন, “আপনাদের সকলেরই নিকট আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।”

পূর্বোক্ত প্রবীন সামন্তরাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “কি, বলুন।”

“অপুত্রক রাজ্যে অবর্তমানে বিকানীর সিংহাসনের বখার্ব অধিকারী কে? রাণী প্রতিভাময়ী, না বিদেশী ভৃত্য শিবাজী।”

আবার দরবার কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া সমস্তের ধ্বনিত হইল, “মহারানী প্রতিভাময়ী।”

“আপনারা রাণীর আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত?”

বহুকণ্ঠে উত্তর হইল,—“নিশ্চয়ই।”

তখন শিবাজীর প্রতি সগর্ভ দৃষ্টিক্ষেপে সদর্প বাক্যে মহীপতি বলিলেন, “তবে রাণী প্রতিভাময়ীর আদেশে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ আমি বলছি, সিংহাসন থেকে নেমে এস শিবাজী।”

নত নয়নে, নত মস্তকে শিবাজী সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন। বিক্রমসিংহ এতক্ষণ বিষ্ময়ে নীরব ছিলেন, এখন শিবাজীকে সত্যই সিংহাসন হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া রোষদীপ্ত কণ্ঠে মহীপতিকে লক্ষ্যে বলিলেন, “আর আমি রাণী



প্রতিভাময়ীর প্রধান ভৃত্যের অধিকারে এবং বিকানীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে বলছি, বিকানীর রাজ্যের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র ব্যতীত শিবাজীই বিকানীর রাজা।”

“তাও আছে সেনাপতি। এই দেখুন সামন্তরাজ, রাণী প্রতিভাময়ীর অমুজ্ঞাপত্র। তিনি আমাকেই বিকানীর সিংহাসন দান করেছেন।”

এই বলিয়া সত্যই মহীপতি মহারাণীর স্বাক্ষরিত অমুজ্ঞাপত্র সামন্তরাজের হস্তে প্রদান করিলেন। সামন্তপ্রবর অমুজ্ঞাপত্র উচ্চকণ্ঠে পাঠান্তে বলিলেন, “রাণী প্রতিভাময়ীর আদেশ আমাদের সর্বদাই শিরোধার্য। আপনিই বিকানীর রাজা।”

গর্জিত কণ্ঠে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, “তা হতে পারে না সামন্তরাজ। আপনারা এই নীচ, ঘৃণ্য শয়তান মহীপতির পাদুকা বহন করতে পারেন, কিন্তু বিক্রমসিংহ তা করবে না। আমি একা সহস্র লোকের শক্তি ধারণ করে, মহীপতির সিংহাসন লাভে বাধা দোবোঁ। শক্তি থাকে আপনারা রোধ করুন।”

ঔদাধ্যময় কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “রাণীর বিপক্ষে বিক্রোহ ঘোষণা করবে সেনাপতি?”

“রাণীর বিপক্ষে নয়, এই নরাদম মহীপতির বিপক্ষে।”

“সে একই কথা। রাণীই ত্রায়ত ধর্মত: বিকানীর অধীশ্বরী। তিনি তাঁর সিংহাসন যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন, এতে ক্রুদ্ধ হবার কি আছে ভাই?”

চতুর মহীপতি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে চিন্তার কিছুমাত্র অব-

কাশ না দিয়া বলিলেন, “আপনাদের সকলেরই তাহলে একমত ? স্পর্শাঙ্করে মুক্ত হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলুন, কি আপনাদের অভিমত।”

প্রবীণ সামন্তরাজ একবার সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “আমরা সকলেই আপনাকে বিকানীরের রাজা বলে অভিবাদন করছি।”

অমনি চতুর্দিক হইতে মহীপতির জয়ধ্বনি উঠিল। সদস্তে মহীপতি পদভরে সিংহাসন সোপান কম্পিত করিয়া সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন, শিবাজী ও বিক্রমসিংহের প্রতি একবার অবজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিপাতে বলিলেন, “রাণীর প্রতি আপনার অকৃত্রিম গাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা দর্শনে বড়ই প্রীত হলেম। আশা করি এই ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটুট অক্ষয় থাকবে। রাজার প্রধান কর্তব্য দুর্বলকে রক্ষা ও অপরাধীর দণ্ডবিধান করা। সিংহাসনের যে শত্রু, সে জাতির শত্রু, দেশের শত্রু, স্মৃতরাং সিংহাসন অধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে আমি সে শত্রুকে বিদূরিত করতে চাই। শিবাজী, তুমিই সেই শত্রু।”

বিশ্বয়ের একটা তড়িৎপ্রবাহ সেই বিশাল জনতার মধ্যে প্রবাহিত হইল। বিশ্বয়ে শিবাজী বলিলেন, “আমি !”

“হা “তুমি !”

“প্রমাণকারী কে ?”

“স্বয়ং বিকানীরের রাজা”।

“অপরাধ কি ?”

“অপরাধ গুরুতর, তুমি রাজ-বিরোধী।”

“রাজ-বিদ্রোহী ! অসম্ভব—মিথ্যাকথা ।”

“সুতরাং হও বিশ্বাসঘাতক । বিকানীরের রাজা মিথ্যাবাদী  
এ বাক্য উচ্চারণ করতে তোমার বক্ষ কেঁপে উঠলো না ?  
আশ্চর্য্য !”

বিকানীরের রাজা হলেও তিনি ছায়ের দাস, বিচারের  
অধীন । অপরাধের প্রমাণ আবশ্যক ।”

“অবশ্য সে প্রমাণ আছে । রক্ষী ! বন্দীকে নিয়ে এস ।”

শিক্ষিত রক্ষী প্রস্থান করিল, এবং অনতিকাল মধ্যে আজাদ-  
আলিকে লইয়া উপস্থিত হইল । উচ্চকণ্ঠে রাজা মহীপতি  
বলিলেন, “সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ, সন্দেহের বশীভূত হয়ে  
আমি এই লোকটাকে ধৃত করি । এ লোকটা রাজপুত নয়,  
মুসলমান । পাঠান সেনাপতি নাসীর-উদ্দীন কবাচারের অহুচর ।  
অহুসন্ধানে এর নিকট হতে একখানা পত্র পাই ; পত্রখানি  
শিবাজীর পত্রের পত্রোত্তর । এই দেখুন সেই পত্র ।”

এই বলিয়া মহীপতি তাঁহারই মতাহুয়ায়ী লিখিত পাঠান  
সেনাপতির পত্রখানি সামন্তরাজের হস্তে প্রদান করিলেন ।  
সামন্তরাজ কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে পত্রখানি সমুদয় পঠিত হইল, মহী-  
পতি বলিলেন, “শিবাজী যে বিশ্বাসঘাতক, তাতে আর সন্দেহ  
নাই ।”

নিষ্পত্ত নয়নে নিষ্পন্দ দেহে জ্বালাময় হৃদয়ে শিবাজী  
জগদীশ্বরের পবিত্রমূর্তি অন্তরে স্থাপন করিয়া বলিলেন, “এক  
করলে পরমেশ্বর ! বংশের কলঙ্কমোচন করতে নিজের জীবন

উৎসর্গ করলুম, তার পরিবর্তে আরও কলঙ্কের পরিতোষ মাথায় এসে প'ড়ল। একি তোমার নির্মম বিচার, বিধাতা ? 'বিশ্বাসঘাতক !'—নাম স্বরণে সমস্ত দেহ কণ্টকিত হয়, উচ্চারণে জিহ্বা জড়িত হয়, সেই বিশ্বাসঘাতক আমি। কোন্ অপরাধে এ বিচার দয়াময় ? শুধু তোমায় মাথায় রেখে, ধর্মকে সম্মুখে স্থাপন করে কর্তব্য পালন করেছি, এই কি আমার অপরাধ ?”

শেষ বাক্যে বিজ্ঞপ্তি নয়নক্ষেপে মহীপতি বলিলেন, “যেমন রক্ত, তার তেমনি ফল। বিশ্বাসঘাতকের রক্তে বিশ্বাসঘাতক কলি ফলে থাকে।”

শিবাজীর সমস্ত দেহে যেন একটা অনল প্রবাহ ছুটিল। শিবাজী কিপ্রবণ অস্ত্র নিষ্কাশনে অশনি-ধ্বনিবৎ ভীষণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “মহীপতি !”

মহীপতি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, “বিশ্বাস-ঘাতকের চক্ষু রক্তিমবর্ণ হয় ; এও একটা নূতন দৃষ্ট দেখালে শিবাজী।”

দমিত ক্রোধে, নমিত অন্ত্রে শিবাজী বলিলেন, “অপরাধ হয়েছে রাজা। ক্রোধের বশে ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি রিকানীরের প্রজা। রাজার বিচারে যে দণ্ড হয়, মাথা পেতে নীরবে সে দণ্ড গ্রহণ করবো। তবে একটা কথা—স্বর্ঘ্য সহস্র পৃষ্ঠীভূত মেঘে আবৃত হলেও তার কিরণ লুপ্ত হয় না। মেঘ কেটে যায়, স্বর্ঘ্য পূর্ণ-কিরণে উদ্ভাসিত হয়। সত্যও সেইরূপ

মিথ্যার আবরণে কখনই আবৃত থাকে না, একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই।”

“রক্ষী! শিবাজীকে বন্দী কর। উপস্থিত তুমি বিকানীরের কারাগারের শোভা বর্ধিত কর। পরে বিবেচনা করে অতি নির্মম, নির্ভর দণ্ডের ব্যবস্থা করব। আর পাঠান অহুচর, তুমি মুক্ত। চর—রাজপুতের অবধ্য।

আজাদ প্রস্থান করিল। রক্ষী কম্পিত দেহে নীরবে দণ্ডায়মান রহিল, শিবাজীর গাত্র স্পর্শে সাহসী হইল না। তদর্শনে তিরস্কারসূচককণ্ঠে মহীপতি বলিলেন, “রাজপুতানার মহাশত্রু রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে বন্দী কর রক্ষী। কি, তবুও নীরব! শীঘ্র বন্দী কর, নতুবা রাজবাণ্ড অবহেলার জন্য প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করবো।”

এবার কম্পাঙ্কিত কলেবরে ইষ্ট নাম স্মরণে রক্ষী অগ্রসর হইল। শিবাজীকে বন্দী করিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। স্বেছায় শিবাজী হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। মহাবীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র শিবাজী সামান্য রক্ষী কর্তৃক বন্দী হইলেন। মহীপতি রক্ষীকে লক্ষ্যে পুনরায় বলিলেন, “যাও রক্ষী, শিবাজীকে কারাগারে নিয়ে যাও।”

রক্ষী শিবাজীকে লইয়া অগ্রসর হইল। শত সহস্র নেত্র শিবাজীর প্রতি স্থাপিত হইল। আবার অনেকের রহস্য-কুটিল নয়নও পতিত হইল। সহসা সমস্ত দরবার কক্ষ স্তিলোড়িত করিয়া ধ্বনিত হইল, “দাঁড়াও।”

রক্ষী, প্রধান সেনাপতির আদেশ—প্রভুর ঈজিত সত্বেও অবজ্ঞা করিতে পারিল না, সভয়ে দাঁড়াইল। শিবাজীর সন্নিহিতে আসিয়া সেনাপতি বলিলেন, “একি শুনছি শিবাজি ! ধর্মের পূর্ণজ্যোতিঃ নরকের অন্ধকারে পরিণত হলো, একি সত্য ?”

বাস্পরুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “সেনাপতি, তার পূর্বে ধর্ম নরকে মাথা গুঁজবে, নরক সদর্পে এসে ধর্মের রাজ্য অধিকার করবে। আর যে যা বলে বলুক, যে যা বিশ্বাস করে করুক, কিন্তু তুমি আমায় অবিশ্বাস ক’রো না ; তাহলে ধর্মের ক্ষীণ-রাশি যেটুকু নয়নে প্রদীপ্ত হচ্ছে, তাও নিভে যাবে, বুকটা ফেটে চোঁচির হয়ে যাবে। যেদিন একবিন্দু বিশ্বাস-ঘাতকতার ছায়া আমার হৃদয়ে পতিত হবে, সেদিন যেন হৃদয়ের শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়,—ঈশ্বরের রোযানলে যেন দগ্ধ হয়ে যাই, সমস্ত দেহটা গুঁড়িয়ে গিয়ে যেন স্তুপে পরিণত হয়। সেনাপতি, ধর্ম যদি নিদ্রিত না থাকে,—ঈশ্বর যদি বধির না হন, সত্য যদি উন্মাদ না হয়—তবে স্থির জেনো, এ অন্ধকার বিদূরিত হয়ে স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, বিমল নির্মল আলোক-রাশি প্রকাশ হবেই হবে।”

“বিধাতা চরণে প্রার্থনা করি, তাই যেন হয়, এ মেঘ কেটে যাক,—বিকানীর-আকাশে পূর্ণ শশধরের তায় আবার তুমি প্রকটিত হয়ে, কর্তব্যের ভেরী আবার বাজাও—ধর্মের জ্যোতিতে বিকানীরকে আবার আলোকোজ্জ্বল কর।”

“অবশ্যই তোমার অকৃত্রিম, আন্তরিক প্রার্থনা পূর্ণ হবে।  
তবে বিদায় সেনাপতি—”  
“বিদায়।”

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজঅন্তঃপুরের এক নিভৃততম কক্ষে রাণী প্রতিভাময়ী একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছিলেন,—“কিছুই তো বুঝতে পারলুম না,—একি হতে পারে! যে শিবাজী স্বর্গীয় রাজার প্রাণ-রক্ষার্থে নিজের প্রাণদানে উত্তম হয়েছিল,—যে শিবাজী বিকানীরের গৌরব—বিকানীরের মান দম্ভার কবল হতে নিজের বিপদ উপেক্ষা করে রক্ষা করেছিল,—যে শিবাজী রাজার আদেশে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে সতত প্রস্তুত ছিল, সেই শিবাজী বিশ্বাসঘাতক, একি হতে পারে! সত্য মিথ্যা, কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না, অথচ মহীপতি যে প্রমাণ দেখালে তাও তো অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু তবু—তবুও হৃদয় আমার বলছে, শিবাজী নির্দোষী; বাতাস যেন বলছে, শিবাজী নির্দোষী; পক্ষীর কাকলীতে যেন ধ্বনিত হচ্ছে, শিবাজী নির্দোষী। যেদিন দম্ভ্য দমনে সে যাত্রা করে, সেদিন তাকে দেখেছি। দেখলুম, তার সে সরল সুন্দর বদনে স্বর্গীয় আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে—দেখলুম, নয়নে তার পবিত্রতার আলোকচ্ছটা ফুটে উঠছে—দেখলুম, দেহে

অপূর্ণ জ্যোতি—ললাটে অপূর্ণ প্রতিভা-দীপ্তি। না—না, সে সরল সুন্দর বদনে, সে উজ্জল মধুর নয়নে বিশ্বাস-ঘাতকতার লেশমাত্র নেই, থাকতে পারে না। জয়চাঁদের পৌত্র হলেও সে দেবতা। নতুবা স্বর্গীয় রাজা না হলে, না বুঝে বিকানীর রাজ্যের রশ্মি তার হস্তে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না, না—কখনই তা পারতেন না। ভুল করেছি, ভুল করে দেবতাকে পিশাচ ভেবেছি, এ ভুল রাখবো না।”

শ্বির নেত্রে ক্ষণিক কি চিন্তান্তে উচ্চ কণ্ঠে রাণী ডাকিলেন, “প্রভাতি! প্রভাতি!”

উত্তরদানে সহচরী রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শিবাজী যে কারাগারে বন্দী, সেটা সাধারণ কারাগার নহে। মহীপতি একেবারে সাধারণ কারাগারে শিবাজীকে বন্দী রাখিতে সাহস করে নাই। ধীরে ধীরে অতি সতর্ক সে অগ্রসর হইতেছিল। সেই কারাগারের একটা ক্ষুদ্রায়তক্ষেপে হীন শয্যা, স্নান নেত্রে, কুঞ্চিত ললাটে, বিরস বিস্তৃষ্ট বদনে মহাপ্রাণ শিবাজী উপবিষ্ট। শিবাজী ভাবিতেছিলেন, “অধর্মের এত প্রকোপ যে, ধর্ম তার ভয়ে মাথা নীচু করে—



জগৎ তার চরণে আনত হয়। অধর্মের প্রতিমূর্তি যে, সে সিংহাসনে মানবপূজিত—আর যে অধর্ম কাকে বলে জানে না; সারা জীবন শুধু ধর্মের আরাধনা, ধর্মের পূজা করেছে, সে অন্ধকারাগারে। তবুও সমুদ্র গর্জে উঠে জগৎ ধ্বংস করেছে না? আকাশ পৃথিবীর বুকে ভেঙ্গে পড়ছে না? নরকের অন্ধকার এসে বিশ্বকে ঢেকে ফেলেছে না? একি অত্যাচার, একি অবিচার, এ কি অনিয়ম তোমার বিধাতা! পিতামহ জয়চাঁদ রাজপুতানার বক্ষে কলঙ্কের যে বিশাল পর্বত স্থাপন করে গেছেন, আমি বংশধর—বাহু বলে সে পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দৃঢ় মূষ্টিতে অস্ত্রধারণ করলুম, পর্বত নত করেছি, আবার সে নমিত পর্বত আরও ক্ষীণ, আরও বদ্ধিত হয়ে ভাগ্যাকাশ ছেয়ে ফেলে। সাধনার পথে একি দুল্লভ প্রাচীর ঘিরে দিলে দয়াময়! এ প্রাচীর উত্তীর্ণ হয়ে নির্মল পবন অঙ্গে মেখে, বিমল হাস্যে জনসমাজে আর কি ভ্রমণ করতে পা'রব? না, এ মক্ষমধ্যে পুষ্করিণী খনন অপেক্ষাও অসম্ভব, নদী-স্রোতে বালির বাধ যেমন—এও তেমনি।”

নির্মম নিষ্ঠুর ঈশ্বর!—না, তোমার অপরাধ কি? অপরাধ আমার কৃতকর্ম ফলের, অপরাধ তোমার উপর সন্দেহে। বিরটি ধনান্ধকারে কোথায় কি কোন্ রত্ন, কোন্ মঙ্গলালোকে লুকিয়ে রেখেছ, তা তুমিই জান। হয়তো এও একটা তাই। অমঙ্গলে মঙ্গল, এতো বিচিত্র নয়! ভগবান! শুধু তোমার করুণা চাই, আর কিছু চাই না।”

সহসা কোমল রমণী কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, “আর কিছু চাও না ?”

চিন্তিত ভাবেই শিবাজী বলিলেন, “আর কি চাইবার আছে আমার ?”

“কেন, মুক্তি ?”

“কে তুমি রমণি ! কোমল কণ্ঠস্বরে পিশাচিনীর নিশ্চয় হৃদয় নিয়ে নির্ভুর গ্লেষে—আমার ব্যথিত ক্ষুধিত হৃদিতন্ত্রী ছিন্ন করে দিতে এলে, কে তুমি পিশাচিনি ?”

“হৃদিতন্ত্রী ছিন্ন করে দিতে আসিনি। তোমার নীরব হৃদি-তন্ত্রীকে নূতন ভাবে গ্রথিত করে নূতন স্পন্দনে, নূতন বাঁকারে স্বকৃত করতে এসেছি। বল শিবাজী, তুমি মুক্তি চাও ?”

“আবার ! আবার সেই গ্লেষবাক্য ! তুমি মানবী, না পিশাচিনি ?”

“আমি বিকানীরের মহারাণী।”

“বিকানীরের মহারাণী !”

সাম্ভ্রম্যে নত নয়ন উন্নত করিয়া শিবাজী রমণীর প্রতি চাহিলেন, রমণীর মস্তকের কনক-কীরিটের উজ্জ্বল আভাষ নয়ন তাঁর উজ্জলিত হইয়া উঠিল। বিস্ময়-চকিত কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “তাই তো ! সত্যইতো বিকানীর-রাজ্ঞী। না দেখে না জেনে অপরাধ করেছি, মার্জনা করুন।”

“অপরাধের বিচার করতে আসিনি, এসেছি তোমায় মুক্ত করে দিতে। বল শিবাজী, তুমি মুক্তি চাও ?”

“এক লীলা তোমার লীলাময় ! যা স্বপ্নের অগোচর, কল্প-  
নার অতীত, সেই দৃশ্য দেখাচ্ছ ; বিকানীরের অধিশ্বরী বন্দীর  
কারাগারে ! মহারাজী, রত্ন ফেলে কেউ ধুলিমুষ্টির আকাজ্জা করে  
না, অনুত ছেড়ে হলাহল কেউ ফেঁছার পান করে না, আলোক  
ত্যাগ করে অন্ধকার কেউ চায় না।”

“তা যদি চাও, মুক্ত তুমি। শুধু মুক্ত নও,—বিকানীর-  
সিংহাসন তোমার।”

“এক রহস্য, রহস্যময়ি ! নিপীড়িত দীন হতভাগ্য ভৃত্যকে  
রহস্যের জালে জড়িত করবেন না !”

“এ রহস্য নয় শিবাজী, সত্য। বিকানীরের রাণী বন্দীর  
সঙ্গে রহস্য করতে আসেনি। সত্যি তোমায় মুক্ত করে দোবো,  
বিকানীরের সিংহাসনে বসাব।”

“করুণাময়ী, এত করুণা তোমার ! যে—জগতের নিকট  
শুধু কঠোরতা, শুধু ঘৃণা উপেক্ষা, শুধু নির্মমতা নিষ্ঠুরতা লাভ  
করে এসেছে, যে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বন্দী, তার  
প্রতি এত করুণা ! শপথ করছি করুণাময়ী রাণী, আপনার  
আজ্ঞা আমার ধর্ম, আপনার কার্যেই আমার পূণ্য। রাজহানের  
পর্কতে পর্কতে উপত্যাকায় উপত্যাকায় স্তম্ভে স্তম্ভে আপনার এ  
করুণা-কাহিনী হৃদয়ের শোণিতে লিপিবদ্ধ করে দোবো, উচ্চকণ্ঠে  
গগন কম্পিত করে এই করুণার কাহিনী জগতে ছড়িয়ে  
দোবো।”

“কিন্তু শোন’ শিবাজী, আমি এর বিনিময় চাই।”

“দীন আমি, এর বিনিময় মহারাণীকে কি দোবো! এক প্রাণ, আর তো আমার কিছু দেবার নেই।”

“সেই প্রাণই আমি চাই। এক রমণী তোমার জন্ত উন্মাদিনী, তার জন্ত তোমার প্রাণ চাই। সেও তোমায় প্রাণ দিয়েছে, তুমিও তাকে প্রাণ দাও। সেই জন্যই আজ আমি তোমার নিকট ভিক্ষার্থী।”

“কে এমন রমণী, যার জন্ত বিকানীরের মহারাণী বন্দী নিকট ভিক্ষার্থী—কে এমন রমণী?”

“সে রমণী তোমার সম্মুখেই রয়েছে, সে রমণী বিকানীরের মহারাণী।”

বিস্ফারিত নেত্রে উন্মাদ কণ্ঠে শিবাজী বলিয়া উঠিলেন,  
“কি, কি! কি বল্লে! আবার বল, আবার বল!”

“সে রমণী বিকানীরের মহারাণী।” উচ্ছ্বল বিকৃত স্বরে শিবাজী বলিলেন, “বিকানীরের মহারাণী—এ বাক্য শোনবার পূর্বে কণ্ঠ বধির হলো না! হৃদ-স্পন্দন নীরব হলো না! শোণিত-প্রবাহ রুদ্ধ হলো না! না না, একি হতে পারে! এ যদি সত্য হয়, তবে এখনি বাড়বানলে বিশ্ব পুড়ে যাবে, ঈশ্বরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে—প্রলয়ের ছায়ায় সব কেঁপে উঠে মাটির ভেতর বসে যাবে—অন্ধকার করাল বদন-ব্যাদন করে সব গ্রাস করবে। ঐ, ঐ দেখ, অন্ধকার ভীষণ মুষ্টিতে গ্রাস করতে ছুটে আসছে! পালাও পালাও কুহকিনী, নতুবা আমারও নিস্তার নেই।

কি, প্রলোভন দেখাচ্ছিল পিশাচিনি ! অধর্মের বিকানীর সিংহাসন ত' অতি তুচ্ছ ; পৃথিবীর সিংহাসন—কুবেরের ঐশ্বর্য্যও চাই না । সরে যা—চলে যা—দূরে যা মায়াবিনী ; বিকানীরের রাণী মরেছে । আছে যে, সে তাঁর ছায়া—তাঁর কঙ্কাল ! তুই প্রেতিনী । যা প্রেতিনী, দূর হয়ে যা । নরকের পুতিগন্ধও তোর বিষ নিঃশ্বাসে নাসিকা কুঞ্চিত করবে, তোকে দেবে পিশাচও চক্ষু মুদ্রিত করবে, রসাতলে পৃথিবীর চিহ্ন বিলুপ্ত হবে । এও কি সম্ভব ! না না, এত অস্বাভাবিক বিধাতার রাজ্যে হতে পারে না, এ ছলনা—পরীক্ষা । মহারাণি ! মাতৃহীন আমি, তুই আমার মা, আমি তোর সন্তান । সন্তানকে স্নেহে সিক্ত করে কোলে তুলে নে মা ! প্রহেলিকা সরে যাক—স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত হোক !”

সহসা জগজ্জননীরূপিণী, শত কোমুদী-কিরণময়ী এক রমণী কারাক্ষে আবিভূত । হইয়া কোমল বাদ্য-সংসারবৎ কণ্ঠে বলিলেন, “তাই হোক বৎস । আজ থেকে তুই আমার সন্তান, আমি তোর জননী । তুল ভেঙ্গেছে, সন্দেহের আবরণ টুটে গেছে । সকল আমার পরীক্ষা । শিবাজী, বীর, তোমায় সন্তানরূপে লাভ করে আমিও ধন্য । যে—ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে, রমণীর রূপের প্রলোভন বা বাহনীয় বিকানীর সিংহাসন, প্রার্থনীয় সম্পদ, সব ধূলির মত উপেক্ষা করতে পারে, সে এই শঠতা-পূর্ণ জগতে বিধাতার একটা উচ্চ আদর্শ, ধর্মের একটা উজ্জলতম প্রতিমূর্ত্তি । তুমি আশীর্ব্বাদের অতীত, দেবগুণ

সম্পন্ন, সৌভাগ্যের অভ্যুদয় শিখরে অধিষ্ঠিত। তোমার প্রার্থিত কিছুই নাই, তবে এই আশীর্বাদ করি, তোমার এই মহতী-মহান চরিত্র চির অটুট, অক্ষয় থাকুক। এস রথীশ্রেষ্ঠ পুরুষশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় সন্তান, আমার সঙ্গে এস।”

### বঠ পরিচ্ছেদ।

দরবারে সমাগত ব্যক্তিবর্গের দিকে প্রসারিত দৃষ্টিতে একবার নিরীক্ষণ পূর্বক প্রবীণ সামন্তরাজের প্রতি নয়ন স্থাপনে রত সিংহাসন হইতে মহীপতি বলিলেন, “নাসীর উদ্দীন কবাচারের অসীম শক্তি, অগাধ ঐশ্বর্য; লক্ষ শাণিত রূপাণ তাঁর আদেশ প্রতীক্ষায় সতত উন্মুক্ত; তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র।”

তত্বতরে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, “এ জীবনও একটা বিড়ম্বনা রাজ্য, এই বিড়ম্বনার জন্ত কত লক্ষ লক্ষ বীরের শোণিতে রাজপুতানার যুদ্ধিকা প্রাণিত হয়েছে, কত লক্ষ লক্ষ বীর বিড়ম্বনা বলেই অবহেলায় হস্তমুখে উন্নত মস্তক শত্রুর অসিতলে পেতে দিয়েছেন, তবুও স্বচাগ্র ভূমি কেউ দেন নি।”

“কিন্তু আমি এই বিড়ম্বনার আশ্রয় গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় রাজ্য ঐশ্বর্য সিংহাসন হারিয়ে, বিকানীরকে শ্রমশানে পরিণত করতে চাই না।”

“আর স্বৈচ্ছায় রাজপুতও পাঠানের পরাধীনতা, পাঠানের পাতুকা বহন করে না। তার চেয়ে যদি বিকানীর অশানে পরিণত হয়, সেও ভাল,—তাতে কলঙ্ক নেই, শ্লেষ নেই, গরল নেই, আছে শুধু গৌরব—আছে বড় শাস্তি।”

“সে গৌরব অর্জন করতে হ’লে লক্ষ বীরের শোণিতের প্রয়োজন, অগাধ ঐশ্বর্যের প্রয়োজন; বিকানীরা তা নাই।”

“আছে বই কি। বীর না থাকে, রমণী আছে। মহিষ-মর্দিনী, বিশ্ব-সংহারিণী রণ-রঞ্জিণী মুক্তিতে অসিধারণ করে, শত্রুর বক্ষ কাঁপিয়ে দেবে। নিরাভরণা হয়ে, দেশের জন্য অলঙ্কার প্রদান করবে।”

“পরাজয় অনিবার্য জেনে আমি বিপদকে আহ্বান করতে পারি না; উন্মাদের মত সর্বস্ব খুঁয়ে সাধের বিকানীরকে প্রাস্তরে পরিণত করতে পারি না। আমি সন্ধি করবো।”

এই বলিয়া তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান পাঠান দূতবেশী আজাদ আলির প্রতি চাহিয়া কি বলিতে উত্তত হইলেন। কিন্তু তাঁর বাক্য উচ্চারণের পূর্বেই সেনাপতি জীমূতনাদে বলিলেন, “তা হয় না রাজা। বিকানীর প্রাস্তরে পরিণত হয় হোক, ইতিহাস—রাজপুতানার এ গৌরব কাহিনী কীর্তন করে রাজপুতের গরিমার কিরণ জগতে ছড়িয়ে দেবে। শুধুন রাজা, সেনাপতি বিক্রমসিংহের ধমনীতে একবিন্দু শোণিতপ্রবাহ যতক্ষণ বইবে; নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যতক্ষণ না রুদ্ধ হবে, ততক্ষণ সে পাঠানের পরাধীন হবে না।”

“রাজকাৰ্য্য তোমার নয়, তোমার কাৰ্য্য রাজ্যদেশ পালন করা।”

“কে রাজা! শঠ, খল, বিকানীর-অঙ্গে পুষ্ট যবন গুণগ্রাহী তুমি! তুমি রাজা নয়, রাজবেশধারী শৃগাল,—তোমার স্পর্শে বিকানীর কলঙ্কিত। মহীপতি, তোমার অন্তরের ছবি বদনে ফুটে উঠছে, নয়নে নরকের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। শোন মহীপতি, তুমি শুধু রাজা, সে আমার অন্তঃকম্পায়—মহারানীর অন্তঃজায়।”

“স্পর্দ্ধা তোমার ক্রমেই বঞ্চিত হচ্ছে বিক্রমসিংহ। সামন্ত-রাজগণ, আপনাদের সর্ব সমক্ষে ভৃত্য—রাজাকে, বিকানীরকে অপমান করছে, আর আপনারা নীরব রয়েছেন!”

মহীপতির বাক্যে তাঁহার পক্ষভুক্ত দু’ একজন সামন্ত দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “সত্য সেনাপতি, রাজ্যের আদেশে প্রতিবাদ করা আপনার অন্তঃচিত।”

ক্রোধে গর্জিয়া বিক্রমসিংহ বলিলেন, “স্বক হও, হীন ঘড়ঘড়কারীর দল।”

এই অপ্রত্যাশিত সত্য স্পষ্ট উত্তরে সামন্তরাজগণ কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। সত্য ঘটনা, জনমণ্ডলীও কতকটা বুঝিল। শত সন্দেহাকুল নয়ন বিক্রমসিংহের উপর আপতিত হইল। মহীপতিও একটু বিচঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তথাপিও সাহস সংগ্রহে বলিলেন, “উন্মাদের বাক্যে আমি আমার ক্রিয়সঙ্গত আদেশ প্রত্যাহার করতে পারি না। শোন দূত,



পাঠান সেনাপতিকে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ে বলবে, আমি সন্ধির প্রয়াসী !”

দূত প্রহানোচ্চত হইল। জীমূতমন্ড্রে বিক্রমসিংহ বলিলেন, “দাঁড়াও। শুহুন সামন্তরাজগণ, শুহুন সর্দারগণ ; জল, স্থল ব্যোমে যেখানে যত দেব দেবী আছেন, সকলের নাম স্মরণ করে এই তরবারি স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবিত দেহে পাঠানকে বিকানীরের তিল মাত্র ভূমি দোবো না। এতে সহস্র বিপদ, সহস্র ঝগড়াবাত যদি মাথা পেতে নিতে হয়, তাও নোব, ঈশ্বরের বিপক্ষে বিজ্রোহ ঘোষণা যদি করতে হয়, তাও করবো,—তবুও স্বেচ্ছায় বিধব্রাতী অধীনতা-শৃঙ্খল কণ্ঠে ধারণ করে কুকুরের শ্রাব্য তার পদ লেহন করবো না। যাও দূত, তোমার প্রভুকে জানাও গে—রাজপুত্র ক্ষীণ দুর্বল হস্তে অসি ধারণ করে না,—বিকানীর এখনও বীর হীন হয়নি, অসির তীক্ষ্ণতা এখনও মলিন বা বিলুপ্ত হয়নি, যুদ্ধক্ষেত্রে বিকানীরের সহস্র তরবারী এক সন্ধে সূর্য্যকিরণে ঝলসে উঠে, উদ্ধার মত গিয়ে পাঠানের মস্তকে পতিত হয়ে তাঁর সমস্ত ভ্রম ভেঙ্গে দেবে,—যাও।”

“বিকানীরের রাজা তুমি নও, আমি। যাও দূত, রাজ-আজ্ঞা পালন কর।”

নীরব অভিবাদনে পাঠান দূত প্রস্থান করিল। রক্তিম বদনে ক্রোধ-অঙ্কিত নয়নে জ্বলদ নিঃস্বনে সেনাপতি বিক্রমসিংহ বলিলেন, “শোন মহীপতি, এত শক্তি আমার আছে যে, আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে

মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে একটা ভূত্যকে সিংহাসনে বসাতে পারি। এতদিন তা করিনি কেন জানি? শুধু রাজভক্তির ক্ষুধার জন্ত—কিন্তু আর নয়। যে বিকানীর স্বাধীনতা বিধর্মীর করে অগ্নান বদনে ডালি দিতে পারে, সে রাজা নয়, সে রাজপুত নয়—এস, সিংহাসন থেকে নেমে এস, রাজপুত কলঙ্ক।”

ক্ষিপ্তবৎ বিক্রমসিংহ সিংহাসন সোপান অরোহণে বাম-হস্তে মহীপতির দক্ষিণ কর আকর্ষণে সিংহাসন নিয়ে আনয়ন করিয়া দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, “বিকানীর সিংহাসনে শুধু মুকুট থাকবে।”

কোমল মধুর পিক-কাকলীবৎকণ্ঠে দরবার কক্ষ ঝঙ্কত করিয়া ধ্বনিত হইল—“সে মুকুট এনেছি বিক্রমসিংহ।”

অতিমাত্র বিস্ময়ে বিক্রমসিংহ দেখিলেন, রাজার প্রবেশ-দ্বারপথে রাণী প্রতিভাময়ী, পার্শ্বে তাঁর শিবাজী দণ্ডায়মান! অবাক বিস্ময়ে বিক্রমসিংহ বলিয়া উঠিলেন, “একি, বিকানীর অধীশ্বর!”

বিস্ময়-তরঙ্গে বিশাল জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এক-কালীন শত সহস্র শির নত হইল। রাণীর জয়ধ্বনিতে বিচারালয় অকম্পিত হইল। তাহাদের জয়ধ্বনিতে বাবা দিমা রাণী বলিলেন, “রাণীর জয় নয়, বল, বিকানীর অধিপতি রাজা শিবাজীর জয়।”

“জয় বিকানীর-রাজা শিবাজীর জয়।”

প্রবীণ সামন্তরাজ বিশ্বম্ভূতককণ্ঠে বলিলেন, “বিকানীরের রাজা, শিবাজী!”

“হাঁ, শিবাজী। তৎপরে ভৎসনাপূর্ণ নরনে স্বীয় সহোদরের প্রতি চাহিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, “মহীপতি! কলঙ্কিত মুখ আর দেখিও না। তোমার স্বরূপ মূর্তি ফুটে উঠেছে। সিংহাসন নিয়ে রাজমুকুট রক্ষা করে, এ বীর-জন-শোভিত দরবার গৃহ ত্যাগ কর।” নীরবে মহীপতি রাণীর আদেশে রক্তিম আননে প্রস্থান করিলেন। প্রবীণ সামন্তরাজ পুনঃ প্রস্থ করিলেন, “বিন্দু জানতে চাই, বিশাসঘাতককে, কোন্ প্রমাণে—”

বাধাদানে রাণী বলিলেন, “প্রমাণ তার পবিত্রতার ভাতি, সত্যের জ্যোতিঃ, আর প্রমাণ আমার বাক্য। অধর্ম যার দর্শনে সঙ্কচিত হ’য়ে মাথা পৌঁছে, বিশাসঘাতকতা যার ছায়া স্পর্শে—সাহসী হয় না, সেই শিবাজী বিশাসঘাতক! এ ভুল ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস হৃদয় হতে উন্মূলিত করুন সামন্তরাজ। শিবাজীর হৃদয় এ মর্ত্যের ধাতুতে গঠিত নয়, বিশ্বের স্বার্থপরতার ছায়া স্পর্শে কলঙ্কিত নয়। তরুণ তপনের অমল-ধবল কিরণে হৃদয় তার উদ্ভাসিত, নির্মল কমলবদনে তার স্বর্গের পবিত্র আলোকচ্ছটা স্ফুরিত, কুসুম-কোমল সরল শুভ্র চরিত্রে তার—দেবতারও ঈদা জাগিয়ে তোলে।”

“তথাপিও—”

সামন্তরাজের অপূর্ণ প্রার্থেই রাণী বলিলেন, “আপনার প্রার্থের পূর্বেই আমি প্রার্থ করছি, এ সিংহাসন কার ?”

“আপনার।”

“আমার আদেশ পালনে আপনারা সম্মত কি না।”

“সহস্রবার—”

“তবে আমার আদেশ, শিবাজীকে বিকানীরের রাজ্য বলে স্বীকার করুন। এস শিবাজী, ধর্মের জ্যোতিতে জ্যোতির্মান হয়ে সিংহাসন উজ্জ্বল কর।”

শিবাজীকে সিংহাসনে বসাইয়া রাণী স্বহস্তে মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন, অমনি সহস্র কণ্ঠে নিনাদিত হইল, “জয় রাজা শিবাজীর জয়।”

নিরাশ হৃদয়ে, স্নান নয়নে, সামন্তরাজ স্ব-আসন গ্রহণ করিলেন। রাণী প্রতিভাময়ী বিক্রমসিংহকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, “দেশভক্ত সেনাপতি বিক্রমসিংহ, আমার এ দানে, এ আদেশে কারও বদনে অসন্তোষের চিহ্ন যদি প্রকটিত হতে দেখ, তবে অস্ত্র প্রয়োগে সে অসন্তোষরাশি বিদূরিত করে দেবে।”

“বিকানীর-রাজ্যের আদেশ শিরোধার্য।”

“সম্ভুট হলুম।”

কৃতজ্ঞতা-উচ্ছ্বাস-জড়িত কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “মহা-রাণি! জননি! সন্তানকে আশীর্বাদ করুন, যেন এ গুরু দায়ীত্বভার বহনে সক্ষম হই।”

“আশীর্বাদ করি বৎস, তোমার সুষম কাহিনী রাজ-

পুতানার পর্বত কন্দরে-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হোক, তোমার প্রদীপ্ত প্রতিভা—মধ্যাহ্ন-ভাস্করের তেজে রাজস্থানের আকাশে ছড়িয়ে পড়ুক—তোমার বীরত্বে, তোমার অস্ত্র-ঝঙ্কারে শত্রু চমকিত—জগৎ বিশ্বয়ে পুলকিত হোক, ধর্ম তোমার রাজদণ্ডে আবির্ভূত হোন, কর্তব্য তোমার সহায়—বিবেক তোমার মন্ত্রী—শ্রায় তোমার অঙ্গের ভূষণ হোক, আর সহস্র ধারায় ঈশ্বরের করুণাধারা তোমার মস্তকে বর্ষিত হোক,—স্বাস্থ্য চির বিনিম্বিত হয়ে রক্ষুক তোমায়।”

আশীর্বাদান্তে রাণী প্রস্থান করিলেন। শিবাজী সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধনে বলিলেন, “শুভুন সকলে, প্রজা আমার ভ্রাতা—বন্ধু, প্রজা আমার পুত্র—সখা, প্রজা আমার হৃৎপিণ্ড—দেহের শোণিত। জীবন দানেও প্রজাকে বিপদাপদে রক্ষা করবো, নিজের সর্বস্ব দিয়েও প্রজার সুখ শান্তি বর্দ্ধন করবো। আমার এ বাক্যের স্বাক্ষী সূর্য, স্বাক্ষী ধর্ম, স্বাক্ষী আমার আত্মা—আর স্বাক্ষী আপনারা। আজ এই শুভদিনে সমস্ত কারাগার উন্মুক্ত করে দিন, অন্ধ আতুরের জন্ত কোষাগারের দ্বার যুক্ত করে দিন, আনন্দ উৎসবে সমগ্র বিকানীর সজ্জিত হোক।”

নতশিরে নতকণ্ঠে বিক্রমসিংহ বলিলেন, “এ আদেশের পূর্বে ভৃত্যের একটী নিবেদন শুভুন রাজা!”

“তুমি ভৃত্য নও, রাজার শক্তি, বিকানীরের স্তম্ভ। কি বলবার আছে, বল সেনাপতি!”

“তুর্ক-সেনাপতি নাসীরউদ্দীন কবাচার বিকানীর ধ্বংসে দৃঢ় সংকল্প হ’য়ে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ সৈন্যসহ বিকানীর রাজ্যপ্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করে আক্রমণের স্বযোগ অপেক্ষা করছে।”

ক্রোধোদ্দীপ্ত কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “এত স্পর্দ্ধা সে যবনের? তার স্পর্দ্ধা গুঁড়িয়ে দিতে হবে। এ সংবাদ কখন পেলেন সেনাপতি?”

“এই মাত্র।”

“এই মাত্র! অথচ সকলে নীরব নির্বাক! শত্রু বিকানীর গ্রামে ঘারে উপস্থিত, অথচ বীরের কোষে অস্ত্রের ঝঙ্কার নেই, উৎসাহের ধ্বনি নেই,—আশ্চর্য্য! সেনাপতি, এই মুহূর্ত্তে যত পার সৈন্য সজ্জিত করে পাঠান সেনাপতিকে আক্রমণ কর। আমি আমাদের পলায়ন পরিহার্য্য, ত্যজিও বিনাযুদ্ধে বন্দীত্ব স্বীকার করবো না। সেনাপতি, তুমি অগ্রসর হয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র পাঠানের শক্তি প্রতিহত কর, ইতিমধ্যে আমি নব সৈন্যদল সজ্জিত করে তোমার সঙ্গে যোগ দোবো। সামন্তরাজগণ, সর্দারগণ! লক্ষ-কৌড়ি-খচিত, লক্ষ বীর-কাহিনী বিজড়িত, লক্ষ বীরের স্পর্শে পবিত্র বিকানীর সিংহাসন আজ পাঠান—ব্যাত্তের ত্রায় হিংসাপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টিতে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। বিকানীর এ ঘন বোর দুর্দ্দিনে, মান অপমান বেয়া-দেবী সব ভুলে, সকলে এক প্রাণ এক লক্ষ্য হয়ে সমুদ্র গর্জনের মত গর্জে উঠে, সমুদ্র তরঙ্গের

ন্যায় শত্রুর শিরে আছড়ে পড়ে শত্রুকে ভাসিয়ে দিতে হবে।  
পাঠানের গর্জকে বিকানীর সিংহাসনতলে নমিত করে দিতে  
হবে, তাকে জানিয়ে দিতে হবে ;—বিকানীর প্রতি ধূলিকণাও  
যেন অগ্নি ফুলিঙ্গ ।”



সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

“অপমান, অপমান, ঘোর অপমান—প্রকাশ্য দরবারে  
অপমান। এ যেন একটা প্রহেলিকার লীলা, যেন একটা  
স্বপ্নের বিভীষিকা! অতি দীন হীনের ন্যায় সিংহাসন থেকে  
নামিয়ে দিলে। যার সহায়ে, যার ভরসায়, যার শক্তিতে  
শক্তিমান ছিলাম আমি, সেই ভয়ীও কর্কশ বাক্যে আমায়  
তাড়িয়ে দিলে। এ অসম্ভব অস্বাভাবিক ব্যাপারের হেতু  
কি সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করা, না অন্য কিছু। কি জানি,  
সবই যেন একটা রহস্য-জালে আবৃত। এ রহস্য-জাল ছিন্ন  
করতে চাই না, আমি শুধু এ অপমানের প্রতিশোধ চাই,  
নরকের গাঢ় অন্ধকারে বিকানীরকে ঘিরে ফেলবো, সম-  
তানের আর্তনাদে বিকানীরকে কণ্ঠিত করে দোবো,  
অত্যাচারের কষাঘাতে বিকানীরকে জর্জরিত করবো, তবে  
এ ক্রোধের শাস্তি হবে। যে স্বাধীনতার গর্জে বিকানীর এত  
অহঙ্কত, এত উন্নত, বিকানীরের সেই স্বাধীনতা অপহরণ করবো।

দেখাবো, মহীপতির ক্রোধ কি ভীষণ, তার প্রতিহিংসা কি নিষ্ঠুর, কি নিশ্চয় !”

সত্যই রাও মহীপতির নয়নদ্বয় প্রতিহিংসায় জ্বলিয়া উঠিল, ক্রোধে ললাটের শিরা সকল ক্ষীত হইল, মুখমণ্ডলে এক পৈশাচিক ভাব প্রকটিত হইল। রাজশ্যালকের চিন্তা শ্রোতে বাধা দানে পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, “বন্দেগী রাজা-সাহেব।”

চমকিত চিত্তে রাও দেখিলেন, পাঠান অল্পচর আজাদ-আলি। বিষাদজড়িত স্বরে রাও বলিলেন, “রাজা? না আজাদ-আলি, আর আমি রাজা নই। এখন আমি বিকানীরের সামান্য প্রজা অপেক্ষাও হীন।”

“কিন্তু, আমরা আপনাকেই রাজা বলে জানি।”

“তা যদি জান, তবে একটা কাজ কর আজাদ। আমি সেনাপতি সাহেবকে একখানা পত্র লিখে দিচ্ছি, তুমি সেখানা তাঁকে দেবে।”

“বেশ, দিন্।”

অপেক্ষা কর, লিখে দিচ্ছি।” কক্ষেই লিখিবার সব সরঞ্জাম ছিল। মহীপতি লেখনী গ্রহণে পত্র লিখিতে লাগিলেন। যে কক্ষটিতে মহীপতি একাকী চিন্তা করিতেছিলেন, সেটা তাঁর গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষ। কক্ষে দুইটা দ্বার। একটা প্রকাশ্য, একটা অপ্রকাশ্য। মহীপতি যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারই পশ্চাতে সেই গুপ্ত দ্বারটি অবস্থিত। দ্বারটি যে উন্মুক্ত আছে,



তাহা চিন্তা-বিকৃত, প্রতিহিংসা-ক্ষিপ্ত মহীপতি বিম্বিত হইয়া-  
ছিলেন। পত্র লিখনান্তে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া, রাও পত্রখানি  
নিবিষ্টচিত্তে নীরবে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই  
সময়ে এক সশস্ত্র বীর পুরুষ অতি ধীরে, অতি নিঃশব্দে সেই  
মুক্ত গুপ্ত দ্বার পথে আবিস্কৃত হইলেন। মহীপতি দ্বারের অতি  
নিকটেই বসিয়াছিলেন। মহীপতির পত্রের উপরিভাগে বৃহৎ  
অক্ষরে লিখিত সঙ্ঘোদন বাক্যগুলি—আগত বীরের নয়নাকৃষ্ট  
করিল। মহীপতি আবৃত্তিতেই মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। তিনি  
বীরের আগমন কিছু মাত্র জানিতে পারিলেন না। মহীপতি  
না পারিলেও আজাদ সে বীর পুরুষকে দেখিল, চিনিল। ভয়-  
চকিত নয়নে শুষ্ক কম্পিত জড়িতকণ্ঠে সে ডাকিল, “রাজা  
সাহেব?”

মহীপতি পত্র হইতে নয়ন ফিরাইবার পূর্বেই সত্ত্ব আগত  
পুরুষটি—সহসা আকর্ষণে মহীপতির হস্ত হইতে পত্রখানি গ্রহণ  
করিলেন। স্পন্দিত বক্ষে সভয়ে মহীপতি দেখিলেন, পত্র  
গ্রহণকারী স্বয়ং শিবাজী। মহীপতির সমস্ত দেহ তড়িতের  
গতিতে কাঁপিয়া উঠিল। সংযত হৃদয়ে মহীপতি রূঢ়কণ্ঠে  
বলিলেন, “কোন্ অধিকারে তুমি আমার পত্র বল পূর্বক  
গ্রহণ কর শিবাজি?”

সামান্য প্রজ্ঞার নিকট বিকানীরের রাজা সে কৈফিয়ৎ  
প্রদানে বাধ্য নয়, নীরব থাকে মহীপতি।”

নিজের নিরস্ত্র অবস্থা ও বর্তমানে শিবাজীর ক্ষমতা স্মরণে

নিরুপারে রাও মহীপতি নীরবে রহিলেন। শিবাজীও নীরবে পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে লিখিত ছিল,—

প্রবল প্রতাপাবিত সেনাপতি নাসীর উদ্দীন কবাচার ;—

সন্ধিস্থাপনের জন্ত যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই। আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা আপনার বিশ্বাসী অনুচর আজাদ আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। শুধু তাই নয়, এই সন্ধির জন্ত যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারি নাই। আমার উপর সেনাপতি ও প্রজামণ্ডলী ত্রুঙ্ক হইয়া আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে। যার জন্ত এত চক্রান্ত, এত কৌশল অবলম্বন করিলাম, সেই আমার পরম শত্রু শিবাজী এখন বিকানীর সিংহাসনে। আর আমার কোন হাত নাই, কোন উপায়ও নাই। তবে একটা উপায় আছে, অগ্গই এই পত্র প্রাপ্তি মাত্র আপনি যদি স্ব-সৈন্তে আসিয়া বিকানীর দুর্গের পশ্চিমদিক আক্রমণ করেন, তবে সুনিশ্চয় দুর্গ অধিকৃত হইবে, কারণ দুর্গের পশ্চিমদিক অরক্ষিত, ভগ্ন, বিকানীর সৈন্তও অপ্রস্তুত, এই অত্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারিবেও না। নিরাশার এই একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসা। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন, তবে আমার কোন অপরাধ নাই। আমার সেলাম জানিবেন। ইতি—

সদাহুগত—

রাও মহীপতি।

পত্র পাঠান্তে দস্তে দস্ত নিপাড়নে রাজা বলিলেন, “বাঃ, সুন্দর! চমৎকার! এবার আর পাঠানের স্বাক্ষর নেই। এবার রাজপুত্রের স্বাক্ষর, রাজ-শ্যালকের স্বাক্ষর। মহীপতি, এ স্বাক্ষর করতে তোমার হস্ত খসে গেল না! অসাড় অবস হয়ে গেল না! আশ্চর্য! তুমি কি রাজপুত্র? তুমি কি মানুষ! না, তুমি নরকের জীব, নরকের প্রেত প্রতিমূর্তি। মানুষের হৃদয় এত নীচ হতে পারে না। যে নীজের স্বাধীনতাদান বিধর্মীরহস্তে তুলে দিতে পারে, তার জন্মস্থান রাজবারায় নয়। কে আছ?”

রাজ-আহ্বানে দুইজন সশস্ত্র রক্ষী প্রবেশ করিয়া সম্মানে রাজাকে অভিবাদন পূর্বক নীরবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। শিবাজী রক্ষীদ্বয়কে লক্ষ্যে বলিলেন, “এই সময়তান দু’টোকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাও। বন্দী-মহীপতিকে ভূমে শায়িত করে আবদ্ধ করবে, যেন নড়তে না পারে। আর তার দেহের ঠিক উর্দ্ধে এক খণ্ড প্রস্তর ঝুলিয়ে অনবরত দোলাবে, যাও। মহীপতি, এই তোমার দণ্ড নয়, কল্লনায় এখনও তোমার কঠোর দণ্ড আনতে পারিনি। আগে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করি, তারপর ভেবে চিন্তে তোমার দণ্ড দোবো—যা দেখে বিশ্বাসঘাতকতার ছায়া কেউ মাড়াতে সাহস করবে না।” শিবাজী প্রস্থানোত্ত হইলেন। আকুল ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন-কাতর কণ্ঠে আজাদ রাজার পথ রোধে বলিল, “রাজা, রাজা, আমি আজীবন গোলাম মাত্র, প্রাণে মারবেন না। দোহাই রাজা, এ ক্ষুদ্র মুষিকের উপর মেহেরবাণী করুন, রাজা।”

আজাদের করুণ কাতরবাক্যে, করুণহৃদয় রাজা বলিলেন, “দাও রক্ষী, এই সময়তান অস্থচরটাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু সাবধান পাঠান, বিকানীর নগরমধ্যে জীবনে আর প্রবেশ করোনা, করলে প্রাণ হারাবে।”

আজাদকে পশ্চাতে ফেলিয়া শিবাজী প্রকাশ্য দ্বারের প্রতি অগ্রসর হইলেন। তথাপি আজাদ আলি পশ্চাৎ হইতেই তাঁহার উদ্দেশ্যে দশটা সেলাম ঠুকিল। রাজা নয়নান্তরালে ঘাইলে, একটা সজোর নিঃশ্বাস ত্যাগে আজাদ আলি বলিল, “বাবারে! প্রাণপাখী উড়ু উড়ু হয়েছিল আর কি। জরুর বড় জোর বরাত, তাই বেঁচে গেছি। বাবা, কি ভয়ানক জাত এই রাজপুতটা। যুখে চোখে যেন দপ্ দপ্ করে আগুন জ্বলে। ভয় ডর কিছু নেই, নিস্পরোয়া। বাঘের মত গর্জ্জ ওঠে, কথায় কথায় তড়াঙ্ক করে থাপ্ থেকে তরোয়াল বের করে। জান খোয়াবে, তবু কথা খোয়াবে না। এ রকম আর দেখিনি, যোধ হয় আর নেইও। আচ্ছা, বন্দী রাজা সাহেব?—তুমি কি সত্যি রাজপুত? আমার তো বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। আর যদিই আপনি রাজপুত হন, তাহলে—আপনাকে কেন যে এতদিন জীবিত রেখেছেন, তাও তো বুঝতে পারি না। বুঝিয়ে দিতে পারেন রাজা?”

প্রজ্জ্বলিত ক্রোধে মহীপতি বলিলেন, “সাবধান পাঠান, বাক্য সংযত কর।”

“ও বাবা, পদ্ম গোখরোর চেয়েও হেলের বিষ যে বেশী দেখছি।

বলি, এ তেজ্জটা দেশের কল্যাণের জন্ত, দেশের শত্রুর শিরে উদ্‌গীরণ করলে না কেন রাজা সাহেব?”

“বিশ্বাসঘাতক পাঠান! বন্দী না হলে এর উত্তর, পদাঘাতে তোমায় দিতুম।”

“বিশ্বাসঘাতক পাঠান, না তোমরা! যদি বিশ্বাসঘাতক না হতে, তবে সাধ্য কি রাজা, সুদূর দেশ থেকে একটা বিদেশী বিধর্মী তোমাদের সোণার ভারতে এসে তোমাদের শিরে পদাঘাত করে! পাঠান বিশ্বাসঘাতক, ঈর্ষান্বিত হতে পারে, কিন্তু সে ব্যক্তিগত জাতিগত নয়। পাঠান—জাতির গৌরব চায়। শত সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে দেখ দেখি রাজা! একটা সামান্য দরিদ্র পাঠানের নিকট হতে কেমন করে তার ঘরের খবর পাও? পাবে না।—ঘাতে জাতির অমঙ্গল, অপঘণ; সে কাজ পাঠান ঘৃণা করে। বিশ্বাসঘাতক, জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী মহীপতি, আমিই তোমায় পদাঘাত করি।”

সজোবে ভূমে পদাঘাত করিয়া আজাদ আলি ক্রত প্রস্থান করিল। নিষ্ফল ক্রোধে রাও মহীপতি শুধু আজাদের গমন দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

## অক্টম পরিচ্ছেদ ।

“এক কর্‌সি ভবানি ! বালুকণার ছায় বিপক্ষের অগণিত সৈন্যের নিশ্বাসেই মুষ্টিমেয় সৈন্য আমার উড়ে গেল । বিকানীর, জননী জন্মভূমি আমার, তোমায় আর রক্ষা করতে পারলুম না । কি করবো, \*উপায় নাই—মুষ্টি শিথিল, দেহ অবনত, অস্ত্রধারণেও শক্তি নেই । ওঃ, ভবানী !”

ক্লান্ত, আহত সেনাপতি বিক্রমসিংহ রণস্থলের রুদ্বির-সিক্ত মুক্তিকার উপরই বসিয়া পড়িলেন । এমন সময়ে সংঘত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল, “সেনাপতি বিক্রমসিংহ ?”

“কেও—পাঠান সেনাপতি ! কি বল্‌ছো সেনাপতি ?”

“আর কেন বীর, এখনও অস্ত্র ত্যাগ কর, বিকানীর সিংহাসনে তোমায় বসাব ।”

“স্বাধীনতার বিনিময়ে—পাঠানের নিকট করুণাপ্রাপ্ত বিকানীর সিংহাসন ! ও কথা আর উচ্চারণ করোনা নাসীরউদ্দীন, অবশেষেও মহাপাপ । পৃথিবীর বিনিময়েও সেনাপতি বিক্রমসিংহ দেশের স্বাধীনতা বিদেশীয় করে বিক্রয় করবে না ।”

“বিকানীরের স্বাধীনতা তুমি বিক্রয় না করলেও আমার প্রতাপে বিকানীর সিংহাসন পাঠানের চরণে নত হ'য়ে পড়েছে । বিকানীরের আর একটিও সৈন্য নাই । বিকানীরের আশা-প্রদীপ একমাত্র তুমি, তাও নিভে যেতে বসেছে । তবে বুখা কেন প্রাণ হারাবে সেনাপতি ?”

“রুখা নয় পাঠান, আমার মৃত্যুতে লক্ষ বীরের নিদ্রা ভঙ্গ হবে। লক্ষ বীর, লক্ষ বিকানীর সন্তান, লক্ষ রমণী বিকানীর স্বাধীনতাদান রক্ষার্থে ছুটে আসছে। হৃদয়-শোণিত ঢেলে দেবে, তবুও স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না। বিকানীর—বিকানীর সমুদ্রের মতন স্বাধীন, আকাশের মত উদার, সূর্যের মত উজ্জল।”

“এখন তবে কি করতে চাও হিন্দুবীর ?” •

অসির উপরে ন্যস্ত দেহভারে উঠিয়া সেনাপতি বিক্রমসিংহ গর্জিত কণ্ঠে বলিলেন, “কি করতে চাই তা আবার জিজ্ঞাসা করছো ? অভিমতের মত—রাজপুত মাতৃগর্ভ থেকে রাজপুতের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করে—বীরত্বের পূজা, দেশের সেবা শিক্ষা করে—স্বাধীনতার ব্রত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর হৃদয়তন্ত্রী নিশ্পন্দ না হওয়া পর্যন্ত রাজপুত সেই ব্রতই পালন করে। এস পাঠান, যুদ্ধ দান কর। আজ বিক্রমসিংহের সব নীরব নিথর হয়ে যাক।”

দেহের সমস্ত শক্তি বিনিয়োগে যেন ঐশী-শক্তি বলে আহত সেনাপতি বিক্রমসিংহ অমিত বিক্রমে পাঠান সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। সে অলৌকিক পরাক্রম দর্শনে পাঠান সৈন্য-পতি বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁর উচ্ছ্বাসে সেনাপতি বিক্রমসিংহের ক্ষতস্থান হইতে শোণিত ধারা ছুটিল। দেহ অবস, হস্ত অবসন্ন হইল, শিথিল মুষ্টি হইতে অসি দূরে নিপতিত হইল। দুর্বল কম্পিত দেহ যুতিকায় লুপ্তিত হইল। ক্ষুধাচিত্তে প্রসংশিত নয়নে পাঠান সেনাপতি বলিলেন, “ধন্য তুমি বীর ! অদ্ভুত,

অলৌকিক তোমার বগশিক্ষা। তুমি মুষ্টিমেয় সৈন্ত-সহায়ে আমার বহুসৈন্য ভূপতিত করেছ। তোমার আসন্ন হস্তের অসি প্রহারে আমার দৃঢ় মুষ্টিও শিথিল হ'য়ে গেছে।”

“আমার এ শোণিতদানেও যদি বিকানীরের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারতুম, তা হ'লে ইন্দ্র অপেক্ষা নিজেকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করতুম। বিকানীর! তোকে রক্ষা করতে পারলুম না, ক্ষমা করিস—অক্ষম সন্তানকে ক্ষমা করিস জননী!”

“বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি বিক্রমসিংহ, ধন্য তোমার দেশভক্তি। তোমার এ দেশভক্তির এক কণিকা আমায় দাও, আমার জীবন ধন্য হোক। বীরচূড়ামণি, তোমার এই অশ্তিম সময়ে—তোমার বীরত্বের প্রভাবে, মহত্বের আদর্শে, দেশভক্তি, মাতৃভক্তির মহিমার নিকট পরাজয় স্বীকার করলুম। আশীর্বাদ কর সেনাপতি, যেন তোমার মত দেশভক্তি লাভ করি, যেন এমনি ভাবে দেশের জন্য, দেশের কার্যে, দেশ-সেবায় প্রাণ বলি দিয়ে—দেশের মাটির উপর শুয়ে মরতে পারি।”

বীরেন্দ্র-কুল-কেতন সেনাপতি বিক্রমসিংহের তখন বাক্শক্তিও নাই, শুধু অক্ষুট-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, “বিকানীর,—বিকানীর,—জননী আ-মা-র—আঃ—”

শেষ কণ্ঠধ্বনি অশেষের রাজ্যে চলিয়া যাইল। শ্রদ্ধানত হৃদয়ে পাঠান সেনাপতি অন্তরে বলিলেন, “শত ধন্য এই রাজপুত জাতি। জানি না, কোন্ রাজ্যের উপাদানে কোন্ ধাতুতে খোদা এদের সৃজন করেছেন। এদের প্রত্যেক কার্য্যটি



কীর্তির এক একটা সোপান। এরা প্রস্তরের মত কঠিন, আবার কুসুমের মত কোমল। হিমালয়ের মত গাভীরাম্য, আবার শিশুর মত হাস্যময়। এক এক সময়ে ইচ্ছা হয়, এদের নিকট বীরত্ব, মহত্ব, রণ-কৌশল, আতিথেয়তা শিক্ষা করি। গুরু ব'লে, দেবতা ব'লে পূজা করি। জগৎকে যেন শিক্ষা দিতে খোদা এই রাজপুত জাতিকে নিজের গুণ গরিমায় ভূষিত করে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন।”

সহসা সাগরোর্ধ্বসংঘাত কণ্ঠে রণস্থল বিকম্পনে ধ্বনিত হইল, “বিকানীর এখনও বীরশূন্য হয় নাই, আত্ম রক্ষা কর পাঠান সেনাপতি।”

বিক্রমসিংহের মৃতদেহ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া পাঠান সেনাপতি দেখিলেন, বিকানীর অধিপতির রাজা শিবাজী দণ্ডায়মান, পশ্চাতে তাঁর সূত্র এক সৈন্যদল।

শ্লেষ হস্তে সেনাপতি বলিলেন, “যেখানে জীবনের আশঙ্কা, শক্তির অল্পতা,—আত্মরক্ষা সেইখানেই প্রয়োজন। তোমার এই মুষ্টিমেয় সৈন্যদলকে পাঠান ভয় করে না। আত্ম-রক্ষা দূরের কথা, পাঠানের শুদ্ধমাত্র পদ প্রহারে তারা মাটির সঙ্গে এক হ'য়ে যাবে।”

“যেখানে কার্যের অভাব, সেইখানেই আমার বাক্যের প্রাচুর্য্য। বাক্যই কার্য্য নয় সেনাপতি। রাজপুত সৈন্যগণ, পাঠানকে আক্রমণ কর, পাঠানের শোণিতে তোমাদের পিতৃসম সেনাপতির তৃপ্তি সাধন কর—তর্পণ কর।”

জীমূতমস্ত্রে সেনাপতি বলিলেন, “পাঠান, পাঠান, রাজপুতকে আক্রমণ কর, রাজপুতের নাম লুপ্ত কর—ধ্বংস কর।”

উভয় সৈন্যদলে উন্নত রণ বাধিল। রাজা নামীর উদ্দীনকে আক্রমণে বলিলেন, “পাঠান, রাজপুতের বাহুর শক্তি সতেজ হৃদৃঢ় কিনা দেখে যাও, যদি জীবিত থাক তোমাদের ঘোর রাজ্যে গিয়ে গল্প করবে।”

তদ্রূপভাবে পাঠান সেনাপতিও বলিলেন, “আর তুমিও গর্ষিত রাজপুত,—তুমিও আজ পাঠানের বাহুবলে যে কত হস্তীর বল, তা মর্মে মর্মে বুঝে নাও। স্থির জেন, পাঠানের শৃঙ্খলই তোমাদের কণ্ঠভূষণ হবে।”

উভয় বীরই উভয়কে বীরবলে আক্রমণ করিলেন। অসংখ্য পাঠানসৈন্যের আক্রমণে মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য একে একে ভুলুপ্তিত হইতে লাগিল। হাশ্মবুখে রণশব্দ্যায় অত্র উপাধানে বীর রাজপুত সৈন্যগণ শয়ন করিল, তথাপি একজনও পলায়ন বা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল না। এক একটা রাজপুত সৈন্য তিন চার জন পাঠানের প্রাণ বিনিময়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিল, পঞ্চ সহস্র রাজপুত প্রায় দ্বাদশ সহস্র পাঠানসৈন্য সংহারে অস্তিম শব্দ্যায় শয়ন করিল। যখন সব শেব হইল, যখন সমস্ত রাজপুত সৈন্য বীর-ব্রত উদঘাপনে অনন্তে চলিয়া গেল, তখন বিজয়ী পাঠান সৈন্য ভীমনাগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ব্যাপার দি দেখিবার জন্য কোতুহলে শিবাজী যেমন পশ্চাতে চাহিলেন, সেই অবসরে অব্যর্থ লক্ষ্যে পাঠান সেনাপতি শিবাজীর অঙ্গবৃত্ত

হস্তে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। শিবাজীর অঙ্গ হস্তচ্যুত হইয়া  
দূরে নিপতিত হইল।

উচ্চকণ্ঠে সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন, “সৈন্যগণ! রাজাকে  
বন্দী কর।”

সহসা জল-স্থল-ব্যোম কম্পিত করিয়া শত সাগর-গর্জন তুল্য  
কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—“আমি জীবিত থাকতে, কার সাধ্য রাজার  
অঙ্গ স্পর্শ করে। আল্লাহ নাম স্মরণ কর পাঠান।”

স্তুতি-বিস্ময়ে রাজা দেখিলেন—বাহিনীর সর্বাঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে  
বিকানীরের নির্বাসিত সহকারী সেনাপতি রণেন্দ্র নারায়ণ!  
বিস্ময়াভূত রাজা বলিলেন, “একি! রণেন্দ্রনারায়ণ! তুমি!”

অগ্রসর হইয়া রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন “হাঁ রাজা, আমিই  
সেই হতভাগ্য। এখন বাক্যের প্রয়োজন নেই, অবসরও  
নেই।”

তড়িতগতিতে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া রাজার ভূ-নিপতিত  
অঙ্গগ্রহণে রাজার হস্তে তাহা প্রদান পূর্বক, শঙ্খ-নিনাদিত কণ্ঠে  
রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “এই নিম্ন রাজা আপনার অঙ্গ, অস্ত্রের  
স্থান মৃত্তিকায় নয়, শত্রুর বক্ষে। অগ্রসর হোন্ রাজা, সমুদ্র  
প্রতাপে শত্রুর শিরে আছড়ে পড়ে, তার গর্ষিত শির নত করে  
দিন, রাজপুত্রের বীরত্ব—গরিমালোকে উজ্জ্বল শ্রীধারণ করুক।”

চকিতে অশ্বরোহণে স্থায় সৈন্যগণের প্রতি লক্ষ্যে পূর্ববৎ  
কণ্ঠে রণেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, “সৈন্যগণ! বীর জননীর সন্তান-  
গণ! দেশ সেবকগণ! তোমাদের বাতৃস্তম্ভ পানের, জীবন

ধারণের, মানবজগৎগ্রহণের সার্থকতা দেখাও। শত্রুসংহারে বীর  
প্রতিষ্ঠা, অব্যয় কীর্তি অর্জন কর, জগতের বরণ্য হও।  
কর—আক্রমণ কর, যায় যাক প্রাণ, থাকুক জননীর মান।”

সহস্র সহস্র কণ্ঠের “জয় ভবানীর জয়” রবে দিগ্দিগন্ত  
কাঁপিয়া উঠিল। পশু পক্ষী শব্দে জন্তু দূরে ছুটিল। হিন্দু-  
মুসলমানে জীবন মরণ সংগ্রাম বাধিল। প্রহরণের ঘাত-প্রতি-  
ঘাতে ভূধর-বিস্ফাটনের শব্দ সৃষ্টি করিল। বীরের ভীম ভৈরব  
গর্জনে, আহতের শমন-হৃদয়-বিদারী কাতর ধ্বনিতে বিশ্বের  
বকে মহা কোলাহল তুলিল। বহুক্ষণ যুদ্ধ চলিল। রণশ্রান্ত  
ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত দুর্বল পাঠান সৈন্যেরা, বলদীপ্ত রাজপুত  
সৈন্যের প্রবল প্রভঞ্জন সম আক্রমণবেগ প্রতিরোধ করিতে  
ক্ষম্য হইল না। সেনাপতি নাসীর উদ্দীন কবাচার রাজার  
হস্তে বন্দী হইলেন। তদ্ব্যতীত নিরাশ কামল পাঠান সৈন্যেরা  
পলায়ন করিল। শমনের ক্ষুধা মিটিল, যুদ্ধ থামিল। রণেজ-  
নারায়ণকে আলিঙ্গনে—আবেগ-কৃতজ্ঞতা-সিক্ত, ঐতিপ্রেম  
সম্পূর্ণিত কণ্ঠে রাজা বলিলেন, “রণেজনারায়ণ, আজ তুমি  
আমার প্রাণদান করলে, বিদ্যাবীরের মানরক্ষা করলে। তুমি  
প্রার্থনার অতীত, আশীর্ষাদের বহু দূরে। তোমার এ মহৎ কার্য  
বর্ণনার ভাষা যে মুক হয়ে যায়।”

“বিনয় কণ্ঠে রণেজনারায়ণ বলিলেন, “রাজার কার্যসাধনে  
প্রজা কখনও প্রদংশাই হতে পারে না, সে যে তার কর্তব্য।  
আর এ শুধু আমার কর্তব্য নয়, আমার মাতের আহবান—দেশের  
কার্য আমার ধর্ম—আমার মনুষ্যত্ব।”

“তুমি মাতৃষের উর্দ্ধস্তরে উঠেছ বীর । সার্থক তোমার অস্ত্র-শিক্ষা, সফল তোমার জীবন, ধনা তোমার মাতৃভক্তি । ঐ দেখ রণেন্দ্রনারায়ণ, বিকানীরের রাজ্যের শক্তি প্রতিহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—বিকানীরের গৌরব স্তম্ভ চূর্ণ হয়ে ধরণী বক্ষে পতিত, বিকানীর আকাশের বীরত্ব-স্বর্গ কক্ষচ্যুত হয়ে ধূলায় লুপ্তিত । বিকানীর-আকাশে উড্ডীন হসে, দীপ্ত বীরত্ব-কিরণে বিকানীরকে আলোকিত করে ঐ দেখ, আদর্শ বীর বিক্রমসিংহ অজানা অস্ত্রাত রাজ্যে বিলীন হয়ে গেছে । বিকানীরের স্তম্ভ পুনরায় বিকানীর আকাশতলে দণ্ডায়মান যদি কেউ করতে পারে, সে একমাত্র তুমি । তোমার অস্ত্র চালনায় যে বিদ্যুৎ ঝলক্ দেখেছি, সে বিদ্যুৎ খেলা বিক্রমসিংহের অস্ত্র ব্যতীত আর কারও অস্ত্রে কখনও দেখিনি । রণেন্দ্রনারায়ণ, বিক্রমসিংহের শূন্য স্থান পূর্ণ করে—এস বন্ধু, এস ভাই, এস সখা দুজনায় মিলে একটা অবল শক্তির উদ্ভব করি ; বংশের কলঙ্করাশি, মিথ্যা অপবাদ সে শক্তিচাপে গুঁড়িয়ে দিয়ে—একলক্ষ্যে, একধ্যানে, একপ্রাণে সাধনার পথে ছুটে যাই এস !”

নবম পরিচ্ছেদ ।

প্রাসাদ-কারাগারে ভূ-শায়িত শৃঙ্খলাবদ্ধ মহীপতি । তাঁহার দেহের ঠিক উর্দ্ধে বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর দোদুল্যমান । একজন গ্রহরী রক্ষু সাহায্যে অবিরত প্রস্তরখণ্ড ছলাইতেছে । মহী-

পতির মনে হইল, ঐ রজ্জু ছিন্ন হইয়া প্রস্তর খণ্ড তাঁহার উপর বৃষ্টি পতিত হয়। প্রতি পলে তিনি প্রস্তর পতনের আশঙ্কা করিতেছিলেন। এই অনির্বাক্য আশঙ্কায় তিনি ক্ষিপ্তবৎ বলিয়া উঠিলেন, “ঐ, ঐ পড়লো, ছলিয়ো না! এখুনি আমার ওপর পড়বে, দেহটা গুঁড়িয়ে দেবে। গেল—গেল, ঐ, ঐ, আবার দোলায়! ছলিয়ো না—ছলিয়ো না—সরিয়ে নাও, ও পাথর পড়লে আমি বাঁচবো না—আমি বাঁচবো না।”

“মৃত্যুকে এত ভয় মহীপতি!” বলিতে বলিতে এক দীর্ঘাকৃতি দিবা কান্তি যুবক দীর মস্তুর গমনে কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। গ্রহরী স্বসম্মানে অভিবাদন করিল। মহীপতির মস্তক সঞ্চালনে ফিরিয়া দেখিবারও উপায় ছিল না, এমন কৌশলে তাঁহার নড়িবার সামর্থ্যটুকুও বন্দী হইয়াছিল। ভীত কম্পিত কণ্ঠে মহীপতি জিজ্ঞাসা করিল, “কে—কে ডাকে?”

“আমি শিবাজী।”

“শিবাজী, শিবাজী, তোমার পায়ে পড়ি ও পাথর সরিয়ে নিতে বল, কখন ও পাথর পড়ে আমার দেহটাকে ধুলার মত গুঁড়িয়ে দেবে! সরিয়ে নিতে বল, সরিয়ে নিতে বল।”

“মহীপতি, এখন বুঝছ? রাজার সিংহাসনও ঐ রকম শূন্যে ছলছে। কখন যায়, কখন পড়ে, তার স্থিরতা নেই। তুমিও যেমন সর্বদাই ভাবছো কখন ঐ প্রস্তর—রজ্জু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তোমাকে গুঁড়িয়ে দেবে, রাজার চিন্তাও সেইরূপ, কখন শত্রু এসে রাজ্য নিয়ে, সিংহাসন নিয়ে প্রাণ সংহার করবে।

এখন জানু—রাজার সিংহাসন কুসুমাবৃত নয়—কটকাকাঁপ;

এখন দেখছ—রাজ্যের জীবনে সুখ শান্তি কিছু নেই, কেবল চিন্তা অশান্তি আশঙ্কা? রাজ্যের একটুমাত্র ভুল—লক্ষ প্রজার অনিষ্ট সাধন করে, রাজা মৃত্যুকে নিয়ে রাজ্য করে। ঐ প্রস্তর খণ্ড অপেক্ষা শত সহস্র গুরুভার রাজা মৃত্যুকে বহন করে;—আর তুমি একটা প্রস্তর পতনের ভয়ে শঙ্কিত! এই দুর্বল হৃদয় নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলে?”

“ঠিক বলেছ শিবাজী, ভুল ভেঙ্গেছে। এখন বুঝেছি’ সিংহাসনে সুখ নেই। আর সিংহাসন চাইব না, আর শত প্রলোভনেও প্রলোভিত হয়ে নিজের সর্বনাশ, বিকানীরের সর্বনাশ ডেকে আনবো না। বুঝেছি, তুমি বিধাতার নিকরীচিত বিকানীরের রাজা। রাজ্যের হৃদয় বিধাতা স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত করেন। রাজা, রাজা, আর অপরাধ করবো না, ভূত্যের মত তোমার আদেশ পালন করবো—দেবতা জ্ঞানে তোমার পূজা করবো—আমায় মুক্ত করে দাও রাজা!”

“মুক্তি দিতেই এসেছি মহীপতি। গ্রহরি, বন্দীর বন্ধন মুক্ত ক’রে দাও।”

গ্রহরী তম্বুহুর্ন্তে রাজাজ্ঞা পালন করিল। মুক্ত মহীপতি বাম্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন, “মুক্তিদাতা! ককণাবান!”

বাধা দানে রাজা বলিলেন, “মুক্তিদাতা! না মহীপতি, আমি তোমার মুক্তিদাতা নই, এই পত্রই তোমার মুক্তিদাতা। পাঠ কর, তা হ’লেই বুঝবে—কে তোমার মুক্তিদাতা।”

শিবাজী একবারি পত্র মহীপতির হস্তে প্রদান করিলেন। বিশ্বাসে মহীপতি পত্র গ্রহণে দেখিলেন, রমণী হস্তাকরে—পত্র

শিরোনামে রাজার নাম লিখিত। অতিমাত্র আগ্রহে মহীপতি পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

ধর্মরূপী শত্রুজয়ী মহাপুরুষ মহাপরাক্রান্তশালী বিকানীর অধীশ্বর রাজা শিবাজী—

আমার ভাতা রাও মহীপতি বিশাসপাতকতার অপরাধে রাজ্য আদেশে কারাগারে বন্দী। অপরাধের তুলনায় শাস্তি অতি লঘু হয়েছে; তথাপিও সে আমার ভাই। স্নেহের আধার ভায়ের প্রতি ভ্রমীর স্নেহ মন্দাকিনী-ধারার জ্বালা প্রবাহিত হয়, বাধা বিঘ্ন মানে না। ভায়ের শত্রু আদার, অত্যাচার, অপরাধ সে স্নেহের ধারায় ভেসে যায়। তাই রাজা, তার মুক্তি ভিক্ষায় এই প্রার্থনাপত্র লিখছি। রাজা, বড় অভাগিনী, বড় দুঃখিনী আমি। এ সংসারে বিধবার ঐ একটা মাত্র ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। সেই ভাই, যে ভাইকে পুত্রের স্নেহে পালন পালন করেছি, সেই ভাই বন্দী, শৃঙ্খলাবদ্ধ, গ্রহরী বেষ্টিত, কদম্বা আহারে উদর পুষ্ট, ভূমিতলে গুণসিক্ত কোমল দেহ নাস্ত। রাজা, রাজা, আমার ভাইকে মুক্ত করে দাও রাজা, অন্তরের সহিত তোমায় আশীর্বাদ করবো। আমার নয়নে অশ্রুর প্রবাহ, হৃদয়ে অনল স্রোত ছোঁচিতে যদি না চাও, তবে এই দীন ভিক্ষারিণীর—এ বিধবা রমণীর ভিক্ষা পূর্ণ করো রাজা। ইতি—

কান্দালিনী

রাণী।

পত্র পাঠান্তে শিবাজী দেখিলেন, রাও নীরবে ভূমি-সংলগ্ন নয়নে কি চিন্তা করিতেছেন। রাজা তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য



করিলেন না, প্রহরীর প্রতি দৃষ্টিপাতে কঠোর কণ্ঠে বলিলেন,  
“প্রহরি, বন্দীর শৃঙ্খল আমার হস্তে পরাও।”

প্রহরী প্রথমে রাজ-আহ্বানে এক পদ অগ্রসর হইয়াছিল,  
কিন্তু আদেশ যখন সম্পূর্ণভাবে শুনিল, তখন পূর্বস্থানে সরিয়া  
আসিয়া নিশ্চল দেহে সত্ৰাস নয়নে রাজার প্রতি চাহিল। অধিক-  
তর কঠোর বাক্যে রাজা বলিলেন, “নীরব নিশ্চল কেন? আদেশ  
পালন কর!”

অবাক বিস্ময়ে প্রহরী বলিল, “কি আদেশ করছেন!”

“এতক্ষণ কি ঘুমিয়েছিলে নাকি! আমার কথা কাণে ঢোকে  
নি? আবার বলছি, ঐ শৃঙ্খল আমার হাতে পরিবে দাও।  
তবুও নীরব! অবাধাতার শাস্তি দোবো, নাও, পরাও!”

শঙ্কিত হৃদয়ে কম্পিত পদে প্রহরী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া  
রাজার হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। বিমুগ্ধ অন্তরে মহীপতি  
বলিল, “এক স্বর্গের ছবি, স্বর্গের সৌন্দর্য দেখাচ্ছ রাজা? মহা-  
পাপী আমি, পাপিণ আমি, তবুও এ অতুলনীয় দৃশ্য আমার হৃদয়  
বিচলিত করে দিচ্ছে। রাজা, রাজা, আমি মুক্তি চাইনা, আমায়  
বন্দী কর।”

“না, যাও মহীপতি।”

“তুমি এত সুন্দর, এত কোমল, এত মধুর, এত তোমার রূপ  
তা ত’ এতদিন দেখিনি! দেবতা যে কত সুন্দর, কত মহানুভা  
জানি না, বুঝি না, কিন্তু সেও বোধহয় তোমার মত নয়। হে  
পরীয়াণ, মহীয়াণ করুণার অবতার! অজ্ঞান অন্ধকে চক্ষু দিয়েছ  
যখন, তখন মার্জনা কর।”

“মার্জনা ঈশ্বরের কাছে চাও মহীপতি।”

“তুমিই আমার ঈশ্বর। করুণা কর, মার্জনা কর দেবতা!”

সহসা দুইটা দেবী প্রতিমা-রূপিণী রমণী কক্ষে দ্রুত প্রবেশ করিলেন, শিবাজীকে দেখিয়া উভয়েই নিরুদ্ধ গতিতে বিস্ময়ে দাঁড়াইলেন। রমণী দুইটির একজন কিশোরী,—তিনি শিবাজীর প্রতি ক্ষণিক চাহিয়া নয়ন নত করিলেন। পদ্যসম গণ্ড দু’টিতে বস্ত্র-রেখা অঙ্কিত হইল। অপর রমণীটির বদন আরক্তিম না হইলেও বিস্ময়-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, বিস্ময়ে রমণী বলিলেন, “একি দেখছি! মহীপতি মৃত; রাজা বন্দী; একি দেখছি!”

সদস্যমানে সম্মতপূর্ণকণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “মহীপতিকে মুক্ত করে দিয়েছি মহারাণী—তোমার নয়নাশ্রু মুছিয়েছি মা।”

“কিন্তু বিকানীরের ভাগ্য-বিধাতার হস্তে শৃঙ্খল পরালে, এমন শক্তিধর কে, তাতো বুঝতে পাচ্ছি না!”

“কেউ পরায়নি মা, আমি নিজেই পরেছি।”

“কেন?”

“কেন? কেন তাকি বুঝতে পারছো না মা? বিকানীরের রাজা আমি, প্রজার পালন কর্তা শাসন কর্তা আমি। তুলা ওজনে প্রজাকে পালন এবং শাসন করা রাজার কর্তব্য। অত্যাচারীর দণ্ড বিধান, তাকে দমন—রাজার প্রধান কর্তব্য। রাজদণ্ডের নিকট সব সমান। আত্মীয়-স্বজন, এমন কি পুত্রের উপরও সে দণ্ড পতিত হয়। যে রাজা অপত্য স্নেহে সে দণ্ড প্রদানে কার্পণ্য করে, সে রাজা অধাৰ্মিক; অধাৰ্মিক রাজার পাশে প্রজা ধর্ম হারায়—আচরণে রাজ ভক্তি হারায়। রাজার সিংহাসন

দু'টো—একটা ধাতুগঠিত, অপর—প্রজার হৃদয়ে অবস্থিত। রাজা যদি কর্তব্যচ্যুত হয়, প্রজার হৃদয়স্থিত সিংহাসন হারায়, সঙ্গে সঙ্গে প্রজার অভিসম্পাতের অধিতে ধাতু সিংহাসনও গলে যায়। রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে যদি কেউ সহায়তা বা মুক্ত করে দেয়, তাহলে রাজদণ্ড ভীষণ ভাবে, ভীষণ তেজে তারই মস্তকে আপতিত হয়। আমি সেই অপরাধে অপরাধী; আমার দণ্ডদাতা বিকানীয়ে কেউ নেই। পাছে রাজার পাপে বিকানীয়ের অমঙ্গল হয়, তাই আমি স্বেচ্ছায় নিজের দণ্ড নিয়ে নিয়েছি।”

“শিবাজি, এখনও তোমায় ঠিক চিন্তে পারলুম না। যতই তোমাকে দেখি, ততই তোমার উজ্জল মূর্তি আরও উজ্জল হয়ে আমার নয়নে উদ্ভাসিত হয়। যতই তোমার কার্য দেখি, ততই মনে হয়, যেন বিবেকের, ধর্মের প্রতিনিধি তুমি—প্রতিমূর্তি তুমি। আমার হৃদয়ের কোণে যে দুর্জয়তা ছিল, আজ তোমার এই মহান আদর্শে সে দুর্জয়তা বিদূরিত হয়েছে। যে অন্ধকারটুকু পুঞ্জীকৃত ছিল, তোমার উজ্জল স্বর্গীয় বিজ্ঞ আলোকে তা ঘুচে গেছে। যাক, এই বন্দীর প্রাণদণ্ড, একে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও, আর রাজার শৃঙ্খল মুক্ত করে দাও।”

ব্যাধাময় কণ্ঠে শিবাজী বলিলেন, “না মহারাজী, এক অভাগিনী বিধবার হৃদয় মরুভূমি করে, চির-অশ্রুজলে তাকে ভাসিয়ে, তার পাজর ধসিয়ে দিয়ে; তার একমাত্র অবলম্বন ঘুচিয়ে আমি মুক্তি চাইনা—মুক্তি পেলেও স্থখী হবো না। তোমার বিরস বহন, অশ্রুপূর্ণ নয়ন আমার স্থখী হতে দেবে না।”

“একের দণ্ড অপরের উপর অর্পিত হয় না। আমি হস্তমুখে এ দণ্ড প্রদান করছি।”

ব্যথিত কণ্ঠে মহীপতি ডাকিলেন, “ভগ্নি!”

গর্জিত কণ্ঠে রাণী বলিলেন, “চূপ্! হৃদয় আমার অটল, বাক্য আমার অচল। তোমার শত কাতরোক্তি, বক্ষ-প্রাবিত অশ্রুজল এ হৃদয়কে আর গলিত করতে পারবে না—যাও।”

“না ভগিনী—তা বলিনি। তবে—”

“তবে ক্ষমা? না, নেই। যাও রক্ষী, বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।”

কিশোরীটী স্বর্ণ মুর্তিটার মত নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; এইবার অগ্রসর হইয়া রাণীর মুখ প্রতি কল্পণাক্ত নয়নদ্বয় স্থাপনে বলিলেন, “মাতুলকে এবারকার মত মার্জনা কর মা!”

রোষক্ষুরিত নয়নে, অগ্নিময় বাক্যে রাণী বলিলেন, “ইন্দ্রজ্ঞা! স্মরণ রেখ—কে তুমি, কার কন্যা তুমি। যাও রক্ষী, আমার আদেশ প্রতিপালন কর।”

রাণীর দৃঢ়, দীপ্ত সতেজ কণ্ঠস্বরে রাজনন্দিনী বুঝিলেন, অমুরোধ উপরোধে এখন আর কোনও ফলই প্রসব করিবে না। রাজকন্যা নীরব হইলেন। মহীপতি জ্বালাময় কণ্ঠে বলিল, “আমার মহাপাপের এই উপযুক্ত দণ্ড। তবে শোন রাজা। মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে আমার রহস্তাবৃত পাপকাহিনী বলে বাই শোন।”

মহীপতি তাহার গুপ্ত রহস্ত, সমতান চক্র একে একে সমস্তই বলিল। কৌশলে সেতু লুকান হইতে, পাঠানের সহিত বড়বয়স



## উপস্থাপন-সিরিজ—১ম বর্ষ।

আদিব সংখ্যার প্রথম উপস্থাপন  
দার্শনিক পণ্ডিত  
শ্রীযুক্ত অরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য  
প্রণীত  
১। পান্ডালী  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
কার্তিক সংখ্যার দ্বিতীয় উপস্থাপন  
মালক-সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত  
এম-এ প্রণীত  
২। বাসুদেবী  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
অগ্রহায়ণ সংখ্যার তৃতীয় উপস্থাপন  
বসন্তমতী-সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ  
বি-এ প্রণীত  
৩। চোরাবালি  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
শৌব সংখ্যার চতুর্থ উপস্থাপন  
শ্রীযুক্ত শৈলবালা ঘোষজায়া  
সরস্বতী প্রণীত  
৪। মহিমা দেবী  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
মাঘ সংখ্যার পঞ্চম উপস্থাপন  
ভারতী-সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়  
বি-এল প্রণীত  
৫। দরদী  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
ফাল্গুন সংখ্যার ষষ্ঠ উপস্থাপন  
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য  
বিভাভূষণ প্রণীত  
৬। শেখরক্ষা  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০

চৈত্র সংখ্যার সপ্তম উপস্থাপন  
উপস্থাপন-মুদ্রকর  
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত  
৭। দীপালি  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
শ্রাবণ সংখ্যার নব-উপস্থাপন  
সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী  
শ্রীযুক্ত স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত  
৮। বিচিত্রা  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নবম উপস্থাপন  
উপস্থাপন-বাহকর  
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রণীত  
৯। রাঙাবন  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
আষাঢ় সংখ্যার দশম উপস্থাপন  
উপস্থাপন-কেশরী  
শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ প্রণীত  
১০। গোপুণি  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
শ্রাবণ সংখ্যার একাদশ উপস্থাপন  
উপস্থাপনসচাধ্য  
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য  
প্রণীত  
১১। জুদের জুদ  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০  
ভাদ্র সংখ্যার দ্বাদশ উপস্থাপন  
স্বাধিকারী ও পরিচালক  
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল প্রণীত  
১২। জন্মপ্রদোষী  
মূল্য ১১ এক টাকা মা: ১০

## উপন্যাস-সিরিজ—২য় বর্ষ।

বঙ্গবিভেদ উপন্যাস লেখিকা

উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী

শ্রীযুক্তা নিকুণমা দেবী প্রণীত

১৩। উচ্ছেদ

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

কার্তিক সংখ্যার চতুর্দশ উপন্যাস

শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু প্রণীত

১৪। প্রতিষ্ঠা

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

অগ্রহাণে সংখ্যার পঞ্চদশ উপন্যাস

শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষ প্রণীত

সরস্বতী প্রণীত

১৫। সূনাহতা

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

শৌর সংখ্যার ষষ্ঠ উপন্যাস

উপন্যাসাচার্য

পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রণীত

১৬। কালো মেঘ

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

মাঘ সংখ্যার সপ্তদশ উপন্যাস

শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু প্রণীত

১৭। চরকার উৎসব

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

২২। অমতা ইন্দিরা দেবী প্রণীত 'পরাঙ্গিতা' মূল্য ১ এক টাকা।

২৫। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত কল্যা-কৌ মূল্য এক টাকা।

২৬। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'স্নাতোর শিবাজী' মূল্য ১।

প্রতি মাসেই একখানি করিয়া নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হয়।  
আমাদের উপন্যাস-সিরিজের নিয়মিত গ্রাহক হইলে প্রত্যেকখানি ঘরে  
বাঁদা সডাক ১/০ এক টাকা একখানার পাইবেন।

শ্রীমোহনবিহারী দত্ত,

শ্রীপরশু পাল।

কাহিন সংখ্যার ষষ্ঠ উপন্যাস

সর্বজন-শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত

১৮। মণিবেল্লম

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

চৈত্র সংখ্যার ঊনবিংশ উপন্যাস

সাহিত্য-সম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতৃপুত্র

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

২১। রাজপুত্রের মেয়ে

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

শুভ বৈশাখের বিংশ উপন্যাস

উপন্যাসাচার্য

পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য  
প্রণীত

২০। লক্ষ্মীর কোঁটা।

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার একবিংশ উপন্যাস

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

২১। অপ্রবাসী

মূল্য ১ টাকা মাং ১০

স্বাধিকারী—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,

১১৪ নং আছিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।







